KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮, [illegible] লেন, কল-২৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিবর (BIVAR)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 2/2-3 3/1 3/2-3 3/4	Year of Publication : Oct-Dec 1977 July-Sep 1978 April 1979 Aug 1979
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : মণীন্দ্র রক্ষিত (2/2-3) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

৮

"....Remember That I am Present in thee
And Lose not hope ;
Each effort, Each Grief,
Each Joy and Each Pang,
Each call of the Heart,
Each Aspiration of thy soul,
All, All Without Exception,
Lead Thee Towards Me,......."

—THE MOTHER

সম্পাদকীয়

কলিকাতা-৭০০ ০০৯
স্থাপিত ১৯৭

এ সংখ্যা প্রকাশের ঠিক আগেই পশ্চিমবঙ্গে উপর্যুপরি দুবার ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এর তুলনা মেলা ভার। জলাধার নির্মাণের মূল পরিকল্পনার গলদেই এই ধারাবাহিক সলিলসমাধির সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে কিনা ? —সে প্রশ্ন দুর্গতির এই ভাষাহারা মুহূর্তে তুলে লাভ নেই। তবে জীবন, সম্পদ, শস্য ও স্বাস্থ্যের ওপরে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হ'ল তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

কেন্দ্র কি সাহায্য করেছেন, করবেন, কিভাবে কতদিনে করবেন, তা আর আমাদের ততটা আশ্বস্ত করেনা। স্বাধীনতা-পরবর্তী স্মৃতির অভিজ্ঞতায় একাধিক সংকটে আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের মানচিত্রের এই অংশটুকুর প্রতি কেন্দ্র চিরকালই একটু অন্যমনস্ক। যাই হোক সমস্যাটা যখন আমাদের, আমাদেরই সর্বশক্তি ও সাধ্য নিয়োগে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। গ্রামবাংলায় বিভাবের বেশ কয়েকশো গ্রাহক ও বহু পাঠক রয়েছেন। তারা কে কি ভাবে আছেন জানিনা, সকলের সঙ্গে তাদের প্রতিও আমাদের উৎকণ্ঠা ও সমবেদনা নিবেদন করি।

এই গভীর দুঃসময়ে জাতি হিসাবে একত্রিত না হলে আরো ঘোর দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসবে। বর্তমান সরকার তার সমস্ত সাধ্য ও শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে চলেছেন ঠিকই, কিন্তু সমাজের প্রতিস্তরের মানুষ এগিয়ে এসে এই ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন না হলে আরো বহু অমূল্য প্রাণ নষ্ট হবে। জীবনের চেয়ে বড় কিছুই নয়, সাহিত্যও নয়। বিভাবের বর্তমান সম্পাদক ইতিমধ্যে দুবার বন্যা অঞ্চলে ঘুরে এসেছেন। ত্রাণকার্য চলছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকু ? সর্বহারা মানুষগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের চোখে যে ঈশ্বরবিরুদ্ধ ভাষা ফুটে উঠতে দেখেছি কোন সাহিত্য তা ভাষায় অনুবাদ করবে !

তবু নির্লজ্জ আকাশে আবার সাদা মেঘ ফিরে আসছে, অনতিবিলম্বে দিগন্তও

হয়তো আবার হয়ে উঠবে নিষ্পাপ নীল। সাহিত্যের শরৎকালীন সৃষ্টি ও শ্রাদ্ধ-কর্মের আলোচনায় অনেকের অবসরও যথারীতি হয়ে উঠবে মুখর। কিন্তু গ্রাম ও গঞ্জকুটীরে সলিলসমাধিতে ইতিমধ্যেই লুপ্ত, বা জন্তু জানোয়ারের মতো এখনো বেঁচে থাকা মানুষগুলির কথা মনে রেখে, আমাদের আরো একবার, হয়তো শেষবার ভেবে দেখা উচিত কেন্দ্রের অর্থকৃপণ মূল বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার ত্রুটীগুলির জরুরি সংশোধনের দাবীতে কি অবিলম্বে সোচ্চার হবো আমরা? না পুনর্বার অপেক্ষা করবো অধিকতর কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের, এবং অন্ন-বস্ত্র ও আরো বহু সমস্যাপীড়িত এই দুঃখী দেশে শুধুমাত্র জলের জন্যই বারংবার কোটি কোটি টাকা জলাঞ্জলি দিতে থাকবো!

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সবিনয় নিবেদন

বন্যার জল ঢুকে প্রেসের মেসিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং জলে ভিজে অনেক ছাপা ফর্মা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক লেখা ছাপা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই বাদ দিতে হলো। এর জন্য লেখক ও গ্রাহকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

পূর্বাশা

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

১৩৮৫

প্রবন্ধ

সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন। কমল কুমার মজুমদার ১

পেট্রন যুগের সাহিত্য ও সাহিত্যিক। বিনয় ঘোষ ২০

অনুবাদ

ধনপতি দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ। মহাশ্বেতা দেবী ৩৩

কবিতাগুচ্ছ

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা:

একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৪১

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একগুচ্ছ অপ্রকাশিত কবিতা ৪৫

শিল্প ভাবনা

পরিপ্রশ্ন প্রণতি পরিগ্রহণ

ব্রেশ্‌ট সমালোচনার বিভিন্ন বিন্যাস। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৫০

বিদেশী সাহিত্য

মেমোয়ারস্। পাবলো নেরুদা ৬৭

বিশেষ রচনা

কি পড়ি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৬

প্রবন্ধ

উনিশ শতকের বাঙালী জীবনে পঞ্জিকা
অমলেন্দু দে / বিনয়ভূষণ রায় ৮১

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবনে
টেলিভিশনের অভিঘাত। কেতকী কুশারী ডাইসন ১০৫

বাণিজ্যচিন্তা

রুগ্ন শিল্প। বিচিত্র গুপ্ত ১২৭

বিশেষ রচনা

"কি পড়ি" লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। হিমানীশ গোস্বামী
পূর্ণেন্দু পত্রী ১৩৪

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার। প্রদীপ দাশগুপ্ত
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। কবিরুল ইসলাম।
সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস।
কলিকাতা-৭০০০১৭

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রোসেস্

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং রাজধানী প্রেস ১১৭/১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২ ও 'রূপলেখা' ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন

কমল কুমার মজুমদার

মাধবায় নমঃ! মাগো যে তুমি কালীঘাটে—তোমাকেই আমি ডাকি! জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুর আমি যে তোমার মুখ চাহিয়া আছি, কবে দেখা পাইব!

ঠাকুর তুমি বলিয়াছ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন।

ইহা আমার কায়মনোবাক্যের সঙ্কল্প হউক!

ঠাকুর, তুমি আমারে ভরসা দিয়াছ যে, মা কথা কয় যে রে!

আমি তোমার কথা ষোল আনা নির্ঘাৎ জানি; ইহার পর আকাশও নাই বাতাসও নাই, ড্যাঙ্গা বসতি নাই। ঐ কথাই সৎ, বই শাস্ত্র সব মেসমার হইয়াছে! এখন আমার সকল কিছুতে, যাবতীয় টানা পোড়েনে, চোরা কুঠরীতে, আলোতে ও অন্ধকারে নিদারুণ বজ্রাঘাত হউক!

আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম ঝম করিতে করিতে মন্দিরের উপরতলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্য সত্যই মন্দিরের দ্বিতলে বারণ্ডায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখনও কলিকাতা এবং কখনও গঙ্গা দর্শন করিতেছেন!

অহো ঠাকুর তোমার ঐ সত্য—শ্রবণ মাত্র আমার দেহ শিহরণে কণ্টকিত হইল; দেখ, আহ্লাদে আমার শ্বাস রুদ্ধ প্রায়, অতঃপর উহা ধারণের মত সমর্থ তোমার কৃপায় আসিল। তবু ঐ দারুণ পদবন্ধ—ঝম ঝম করিতে করিতে, যেই মাত্র উপলব্ধি করিলাম, তখনি আমার অনাদি কালের অন্তহীন জাগরণ, আমাকে

ঠাসিয়া ধরিল ; রোমকূপ স্ফীত হইল, ঐ শব্দ তরঙ্গ মরমে প্রবিষ্ট হওয়ত আমাতে মহা আলোড়ন, ইহা আনন্দই, উপজিল !

এবং এই দেহতত্ত্বে অকস্মাৎ চিন্ময়ত্ব সম্পাত হইল, আর তখনই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তুমুল মোচড় দিয়া উঠিল, আমার হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তচনচ, আমি যন্ত্রণায় ত্রাহিকার করিলাম, ক্রমে পুনঃ ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক হইল। জয় মা !

এবং ঐ সত্যতে আমাতে মনোরমত্ব বুদ্ধি সম্ভাইল ! আমার সমক্ষের প্রতীয়মান যাবতীয়—অতীত যাহা একদিন, ভবিষ্যতে যাহা কখনও যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম হইতে জড়তা অপসারিত হইল ! আমি গঙ্গাজলে মুখ ধুইয়া গঙ্গাজল মাথায় ছিটাইয়া দশদিক পর্য্যবেক্ষণ করিলাম !

আঃ তোমরা শুন, ঐ আমাতে সেই লাইন ধ্বনিত হইতে আছে যাহা অলৌকিক পুণ্য ঈশ্বর দর্শনের প্রথমেই আছে !

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বর পাটনী

সেই মাত্র ঐ কথাগুলি আমার ঠোঁটে খেলিয়া উঠিল তন্মুহূর্ত্তেই আমার মন বেসামাল, আমি মহা ভারী হইয়া উঠিলাম, চক্ষুদ্বয় ফুলিয়া উঠিল, আমি দেখি আমি দুধে আলতার হইয়াছি, যুগপৎ মাদকতা ও চেতনা আমার দেহতে হানা দিল আমি টলিতেছি !

মাগো, ঐ লাইনটি আমার জন্মে জন্মে তুমি। ঐ লাইনে আমার নুপুর পরাইবার বড় সাধ ! কি বা জ্যোতির্ম্ময় ঐ শব্দলহরী, আহা দেখ দেখ আমার লৌহ নিগড় সকল পুড়িয়া খাক হইতেছে—যাহাকে চৌরঙ্গীর ভূতুড়ে হট্টগোল কখনওই নিভাইতে পারিল না ; আমার এহেন ভাগ্যে ঐ মাংসপিণ্ডগণ যাহারা টেবিলের ঐ পাশে বসিয়াছিল তাহারা নেহারিল মাত্র—তাহারা তাচ্ছিল্য করিল – হায় তাহারা !

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বর পাটনী

মাগো ঐ লাইনে আমার মর দেহ লুকাক !

মধুসূদন খেয়াঘাটের পাটনীর গৌরবে যাদু হইলেন, তিনি স্পষ্টত দেখিলেন, সেই পরম নৌকায় শিবের ঘরণী !

কে তোর তরীতে বসি ঈশ্বর পাটনী।

তখন কিছুক্ষণ হর, বালিকাবয়সী জগজ্জননী ঈশ্বর পাটনীর নৌকায় বসিয়াছেন।

মন, একবার তুই দেখ, ত্রিভুবনের সেরা এই দৃশ্য, নৌকায় পা ঝুলাইয়া মা জননী আর ঈশ্বর পাটনী দাঁড় বাহিতেছে ! কি সুন্দর !

এই সে গাঙনি—গঙ্গাতীর। আমি আছি, আঃ এখন দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গার হাওয়া মদীয় চোখেমুখে ঝাপটাইতে আছে, আমার সারা দেহ শুদ্ধ করিতেছে ; তীরস্থ বৃক্ষ পত্র সকল মৃদু আন্দোলিত, এইখানে আমি আর সেই চির সত্য !

ঐখানে ঐ খেয়াঘাট, মা জননী ঈশ্বর পাটনীকে দয়া করিলেন, অহো আমাদের সভ্যতায় কোন দিন কৃষ্ণবর্ণমেঘ ঘনাইয়া আসিবে না। আমি ইহা হৃদয়ঙ্গমে উদ্বেলিত হওয়ত একাই লাখকণ্ঠে, ঈশ্বর পাটনী, ঈশ্বর পাটনী, চীৎকারিয়া দিক সকল ফাড়িলাম, জগতের সোনা চাঁদি, নদ নদী, বনরাজী ঈশ্বর পাটনী হইয়া যাক—আমায় দেখা দিক ! আমার দশাসই স্বর গঙ্গার কম্পিত তরঙ্গলহরীতে প্রতিধ্বনিত হইল। রাখাল বালকগণ আমার এ প্রমত্ততায় অবাকিয়া চাহিয়াছিল।

এই খেয়াঘাটে, সেই অলৌকিক ঘটনার পূর্ব্বের মুহূর্ত্তে মা, কুলবধূরূপে এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং 'পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে'। আমি তীরের ঘাসে অতিবড় সন্তর্পণে গ্রাম্য ভীরু শ্রদ্ধায় একদার সেই পদচিহ্ন চুরিলাম,— পাছে ঐ পদচিহ্নে পা পড়ে তাই ঘাসে আঘ্রাণিতে লাগিলাম ! এবং তখন সেই গীত গাইয়াছি।

মঞ্জল আমার মন ভ্রমরা, শ্যামাপদ নীল কমলে !

সেই পদচিহ্নের ছবি আমাতে উৎকীর্ণ আছে ; আমি এয়োদেরকে দেখিয়াছি, ইস তাহারা কি নিঃশঙ্ক চিত্ত ! আলপনার পদ্ম আঁকিতে কদাচ তাহারা সদ্য প্রস্ফুটমান জলবিন্দু মণ্ডিত পদ্মের দিকে নেত্রপাত করিল না, কয়েকটি রেখায় পদ্ম আরোপিল, এই পদ্ম পিটুলির—সেই পদশব্দ উহা রণিত ভ্রমর আসিল !

মাগো আমার ঠিকানা সেখানেই হউক—হরিণের চোখ আর নহে !

এইরূপ শোভা কপিলেশ্বরে ঘাসের উপর ছোট ছোট শ্রীযুক্ত পদচিহ্ন দর্শনে মহাযোগিনী গৌরী মা, মা মাগো বলিয়া কান্দিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। সেই পদ চিহ্ন আমার এ দেহ—মায়ের পদ চিহ্ন ! এই বাক্যতেই কালো আকাশে বিদ্যুৎ খেলিয়া উঠিল। জল ছাড়িয়া মৎস্য উর্দ্ধে লাফ দিয়া উঠিল। আমি জানলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যিনি জগৎ ঈশ্বরী, তাঁহাকে পার করা কত বড় ভাগ্যের! এই খেয়ার পাটনীর মত কপাল আর কোন সাধকের! কত গীত বাঁধা হইল, কতশত বারব্রত, তিথি নক্ষত্র করা হইল, পাজড়া সার তপস্যা—গান্ধার ভাস্কর্য্যে যেমন আছে —কে বটে ঈশ্বর পাটনীর মত! ঈশ্বর পাটনী মাকে একাকিনী দেখিয়া, তাঁহারে পার করিতে হইবে ভাবিয়া বড় আতান্তরে পড়িল। মাগো তুমি কুলবধূ আমি শেষ কোন দায়ে না পড়ি!

মা তাহারে সবিশেষ বিশেষণ দিয়া···অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। এইভাবে সতীনের ঘর অবধি—সকল কিছুই, কথার ছলে বাঁধিয়া নিজ স্বামীর পরিচয় দিলেন। ইত্যাকার কথায় ঈশ্বর পাটনী তবু সহানুভূতি জানাইয়া বলিয়াছিল, যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল। কি আর করিবে?

অথচ কালকেতুব্যাধের ঘরণী ফুল্লরা চণ্ডী ঠাকরুণের এইরূপ কথায় উপদেশ দিল।

সতীন কোন্দল করে দ্বিগুণ শোনোবে তারে
কেন ঘর ছেড়ে হও মানী।

ঈশ্বর পাটনী ফুল্লরা নহে। সরল প্রকৃতির মানুষ, কুলবধূকে নৌকায় তুলিয়া লইল। মা জননী রহস্যরঙ্গ প্রিয়—নদীর জলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিলেন, তাহা স্মরণে কবি মহানন্দে স্তব গান করিলেন:

কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ
... ...
চেয়ে দেখ, পদ ছায়া তলে
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে

আহা মধুসূদনে চন্দ্রালোকের অপব্যয় নাই।

ঈশ্বর মা জননীকে সাবধানিল, মা এইরূপ পা ঝুলাইয়া বসিও না—পা তুলিয়া বস।

এই প্রকার কথায় মা তিতি বিরক্ত হইলেন, তাহার নলক দুলিয়া উঠিল, মুখ ঝামটাইলেন,

তোর নায় ভরা জল
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল॥

মা গো তুমি এত কাছে, আঃ কি রম্য ঐ মানুষী ধমক—দেখ, দেখ, আমার

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঝঙ্কারিতেছে, আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল! এই পঙক্তি বার বার আবৃত্তিতে আমি কি সহজ—আমার গ্রন্থি সকল শিথিল হইল; আমার পতঙ্গত্ব অতীব সমুৎ আমি নদীতে ডরিব না। ঐ লাইনেতে আমার ইহকাল লেখা!

ঈশ্বর পাটনী তাহার নৌকার সেঁউতি, জল সেচিবার পাত্রটি দেখাইয়া কহিল, সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ! এবং যখন ছাপোষা গ্রাম্য পাটনী দেখিল, সেঁউতি উপরে কুলবধূ চরণ রাখিতেই উহা সোনার হইয়া গিয়াছে, সে তখন বিস্ময়ে হতবাক হইল, 'এ মেয়ে ত মেয়ে নয়!' জানিতে চাহিল, বল মাগো তুমি কে বটে?

দেবী উত্তর দিলেন, আমি দেবী অন্নপূর্ণা কাশীতে প্রকাশ!
তবে যে দিয়েছ দেখা সে তোমার দয়া।

শ্রীশ্রীমাঠাকরুণের—জগজ্জননীর ঐ বালিকারূপে আমার ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে, আমাকে বড় অস্থির করিয়া তুলিল, বাঁচার প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমি তোলমোচড় সন্ধান করিয়াছি; বুঝিলাম, খেয়া ঘাটের ঐ সৌভাগ্যতে আমার চিত্তে বিমোহ আচ্ছন্নাইতেছে, এক শুভ্র আলোক আমার সর্ব্বত্রের এবং স্থানের এবং কালের অনু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইতেছিল।

আমার অন্তরের উদ্ভিদত্ব জীবত্ব রঙমহিমা ধূলা বহমানতা যেতক কিছুই যুগপৎ জয় জয় বলিয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল। ঐ না গঙ্গা! আ ঐ না কালীঘাট! আ ঐ না কাশী! ঐ না কৈলাস! জয় ঈশ্বর পাটনী তুমি ধন্য।

অতঃপর আমি এক আদি অন্তহীন বিশাল শূন্য মাঠে আনীত হইলাম, তাজ্জব একাকিত্বে আমি মর্দ্দিত হইতে থাকিলাম, এমত সময়ে প্রত্যক্ষিলাম, বিস্ময়কর রহস্যবাচক এক জলবিন্দুর অন্য দিকে—আপন পর সমস্ত সম্বন্ধগুলি, আকর্ষণ বিকর্ষণাদি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়ত গড়াগড়ি যাইতেছে! আমি নিশ্চিত হইলাম যে আমার মধ্যে বিভ্রান্তি নাই।

আমি এক অপূর্ব্ব চৈতন্যের কাঠামো!

পরক্ষণেই অনুভব হইল ইহা যে, ঐ দুস্তর প্রান্তরে আবছা আলোয় আমার রূপান্তর ঘটিতে আছে; যে কোনও সাবিত্রীঅঞ্জলিতে এই আমি পদ্মগন্ধ জলবৎ হইয়াছি এবং ক্রমে দেখিলাম নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কোন সুন্দর রাঙা পদ ধৌত করিতেছি এবং ঐ পদদ্বয় হইতে এখন বিন্দু বিন্দু উল্লম্ফিয়া অন্যত্র পতিত হইতেছি

—এখন পুষ্প হইয়া ফুটিতেছি, তখন পতঙ্গ হইয়া আকাশে উড়িতেছি। নিশ্চয় ইহা আমার ঠাকুরকে ডাকিবার সৌভাগ্য, ইহা আমার সেই গীত গাহিবার সুকৃতি :

আমি মলে দুর্গানাম আর কেউ লবে না।

তোমাদের বলি নাই ইহার পরেই, আমার মনোরমত্ববুদ্ধি সমুদ্রদর্শনে স্থির হইয়াছিল।

ইহার পর অন্ধকারে আলোকে আমি বহুদেশ ভ্রমিলাম; আমার বুকে সেই মহাচিত্র আঁকাটি সম্বল করিয়া ঘুরিলাম; নিরখিলাম, ঐ সুবিরাট ধ্যানমগ্ন সভ্যতা কি বিচিত্র, কি সরল! ধুনি অহর্নিশি জলিতেছে,অল্প শিখায় সন্ন্যাসীর সমাধিস্থ মূর্ত্তি শান্ত সৌম্য সুবিশাল। এখন বহুতে এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অসিঘাটে গঙ্গায়ে অর্দ্ধাঙ্গ নিমগ্ন করত শ্লোক পাঠ করিতেছে। কেহ মালা জপিতেছে। আমি তীর্থযাত্রীদের সঙ্গ লইলাম, কোথাও চিরবৃক্ষরাজি, দেবদারু এখন রডডেনড্রন উচ্চতা ছাড়াইয়াছি দূরে মন্দির দর্শনে সকলে অথর্ব্ব বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ বৃদ্ধা—জয় বদ্রীকা বিশাল কি জয়! এই ধ্বনি করিল। তখনই আলোক বিচ্ছুরিত হইল। ঐ বদ্রীনারায়ণ আর কিছুদূরে সন্ন্যাসী গঙ্গাধর মহারাজ কহিলেন, দেখ, মানা পাস ঐখানে পার্ব্বতীদের বাড়ী।

পার্ব্বতীর বাড়ী শ্রবণে আমার অন্তর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, সর্ব্বদাই এই হিমালয়ে এক বিচিত্র ওঁকার ধ্বনি শ্রুত হয়। ইহা অনাহত শব্দ, আমার রোমাঞ্চ উদারে দ্বিগুনিত করিল। পার্ব্বতী, মা আমার কি ছেলেমানুষ মা ছিলেন, হরিণের চোখ বড় না তাঁহার চোখ, ইহা মাপিতে গিয়াছিলেন। কালিদাস কত কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ বালিকাত্ব—হরিণের চোখের সহিত চোখ মাপিতে যাওয়া আমারে ভিখারী করিয়াছে।

অরণ্য বীজাঞ্জলি দান লালিত
স্তথা চ তস্যাং হরিণা বিশশ্বস্থ ঃ॥
তথা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতূহলাত্
পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে॥ কুমারসম্ভব। পঞ্চম—১৫

পার্ব্বতীর অঞ্জলিপূর্ণ নীবারধান্যে (উড়িধান) প্রতিপালিত হরিণেরা তাঁহাকে এইরূপ বিশ্বাস করিত যে, অনায়াসেই পার্ব্বতী কৌতূকবশতঃ সখীগণের সম্মুখেই মৃগদের নয়নের সহিত নিজ নয়নের পরিমাপ করিতেন—

ইনিই ফড়িং ধরিতে সখীদল লইয়া ছুটাছুটি করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য

কি। ঠাকুর কালীঘাট গিয়াছেন, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে পুষ্করিণী আছে তাহার উত্তর পাড়ে অনেক কচু গাছে প্রায় বন হইয়া আছে। ঠাকুর দেখিলেন জগজ্জননী একখানি লাল পেড়ে কাপড় পরিয়া কুমারী বেশে আর কতক কুমারীর সহিত সেখানে ফড়িং ধরিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। তখন ঠাকুর মা মা বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গ হইলে মন্দিরে গিয়া দেখেন শ্রীবিগ্রহে সেই একই সাড়ী! একথা ঠাকুর হৃদয়কে বলিলেন।

সে মহা আপশোষে কহিল, মামা তখনই বলিতে হয়, মাকে দৌড়াইয়া গিয়া ধরিয়া ফেলিতাম।

তাহা কি হয়, মা না ধরা দিলে কাহার সাধ্য যে ধরিতে পারে! তাহার কৃপা না হইলে কেউ তাঁহার দর্শন পায় না!

যিনি পাইজোর পরিয়া ঝম ঝম করিতে করিতে মন্দিরের দোতলা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কখনও কলিকাতা কখনও গঙ্গা দর্শন করিতে ছিলেন, যিনি ঈশ্বর পাটনীকে ধমক দিলেন। আর এখন সেই তিনি—যিনি নৌকা থামাইতে বায়না করিলেন ইনি শ্রীশ্রী সর্ব্বমঙ্গলা বড় জাগ্রতা দেবী, গঙ্গার উপরেই ইহার দক্ষিণ দুয়ারী মন্দির ছিল। রামপ্রসাদ ঠিক ঐ মন্দিরের পাশ দিয়া, গান গাহিতে থাকিয়া নৌকায় যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে এক কুমারী কন্যা দক্ষিণ দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া আবদার করিলেন, কেরে গাইছিস গান, একটু থেমে গা।

রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ সুরে মিলাইয়া কহিলেন, সাধ থাকে ত ফিরে চা।

আশ্চর্য্য এই মিল দেওয়ার জোর—এই উত্তরের সঙ্গেই শ্রীশ্রীমায়ের, সর্ব্বমঙ্গলার দক্ষিণ দুয়ারী মন্দির ঘুরিয়া পশ্চিম দুয়ারী হইল! রামপ্রসাদ তদ্দর্শনে আত্মহারা হইয়া গীতের পর গীত গাহিয়া ছিলেন।

মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন না কেউ দেখে!
আদরিণী শ্যামা মাকে!

আমি কোনক্রমে বলিব না, আমাদের ভাগ্যে ঐরূপ যোগ পাঠ অসম্ভব! নিশ্চয়ই আমি ঠাকুর যে পথ বলিয়াছেন সেই মত করি, 'ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে' গীতটি প্রাণ দিয়া গাহি—তবে এখনই হইবে। আমাদের রক্তে জগজ্জননীর জন্য টান বহিতেছে। বহুকাল হইতে মায়ের আরাধনা চলিয়াছে। ভূদেববাবু বলেন, তন্ত্র শাস্ত্রের জননী বঙ্গমাতা! এখানে রাজা হইতে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দীন দরিদ্র মায়ের জন্য জীবন পণ করিয়াছে, যে মাকে একবার

নয়ন ভরিয়া দেখিব। মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার বিবিধরূপ, পটপূর্ণিমায় বিরাট প্রতিমা আমাদের জীবনকে মহা উদ্দীপনায় জরাইয়া থাকে!

স্বয়ং মহাপ্রভুই অন্তরে শাক্ত আর বাহিরে বৈষ্ণব।

ন্যাংটা মাকে মানিয়াছিল।

আমরা যখন বিভিন্ন গ্রামে যাই তখন দেখি, দরজায় দুই পাশে কি অপূর্ব্ব ফুলকারী আলপনা আঁকা, এই ফুলকারীতে রঙ দেওয়া হইয়াছে, এবং দরজার ঠিক মাথায় লেখা, এস মা আনন্দময়ী। এমনই দরজার সমক্ষে দাঁড়াইয়া ঐ লেখাটি পড়িলে অনেক পথভ্রমণের ক্লান্তি নিমেষেই দূর হইয়া যায়, তখনই স্মৃতি জাগিয়া উঠে—প্রবাল মুক্তা লইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে বেলা তটে খেলার আমোদ! মা আনন্দময়ী।

রামপ্রসাদে মহা আনন্দে উছলিতেছে, মা যে তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন—তাহা ঠাকুরের অভিমান শুনিলে আমরা জানিতে পারি, ঠাকুর তখন ভবতারিণীকে গান শুনাইতেছিলেন, হঠাৎ তিনি এই গীত গাহিতে অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, 'আর কবে দেখা দিবি মা হর মনোরমা! তিনি শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন, কাতর কণ্ঠে বলিলেন, মাগো রামপ্রসাদকে দেখা দিয়াছিস, আমায় কেন দেখা দিবি না। অথচ ঠাকুর নিজে পূর্ণ ব্রহ্ম, কিন্তু মানুষী দেহতে সব কিছু মানুষের মত হইবে। আবার বলা যায়, এত লক্ষ মূঢ়দের মঙ্গলের জন্য সাধনা একা একটি মানুষে করিল, তাই গঙ্গার তীরে মা মা বলিয়া মুখ ঘর্ষণ! এখন আমাদের নিকট—রামপ্রসাদ যে কি তাই জানাইয়া দেওয়া ঐ খেদোক্তির কারণ আহা রামপ্রসাদের কি গান! বাসি কাপড়ে রামপ্রসাদী গান গাহিলে নরকবাস হয়!

রামপ্রসাদকে বিস্ময়করভাবে তখনকার শিক্ষিতরা বিচার করিয়াছেন, 'ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগ বিরাগী হইয়া সুপবিত্র প্রীতচিত্তে গীত ছলে পরমপূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন! (হায়রে ঈশ্বর গুপ্ত আর যে তুমিও অবশেষে কিনা ইহা মন্তব্যিলে!) নিরাকার ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্ম শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাহার উপাসনা করেন ইনি কালী নাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন। ইহাতে পুরুষ প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য ভাব রস ভক্তি প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না!

বেচারী ঈশ্বর গুপ্ত তখনকার মূর্ত্তিপূজার বিরোধীদের তোড়ে কোথায় যে

গিয়াছিলেন তাহা ঐ উক্তিতেই বুঝিলাম এবং অতএব জানিতে চাহেন না, যে রামপ্রসাদ গাব গাছে পদ্ম ফুটাইয়াছিলেন।

এই মাতৃভক্ত রামপ্রসাদকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন, রামপ্রসাদ বেশ বুঝিতেন, লোল রসনা নরমুণ্ডমালা শোভিতা, জড় পাষাণ প্রতিমার সম্মুখে সহস্র নিরীহ মহিষ এবং ছাগ শিশু বলি দিয়া মায়ের পূজা হয় না।

রামপ্রসাদ মন্দিরবিশেষবদ্ধা প্রতিমাকে কালী বলিতেন না, গানের মধ্যেই বলিয়াছেন:

ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না।
কেমন দিতে চাস তায় মহিষ আর ছাগল ছানা॥

এবং পরে ইহা প্রকাশিলেন যে,—গান দেখিয়া মনে হয় তিনি প্রথমে যাহাই থাকুন ইদানীং নিরাকার উপাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং অবশেষে বিশ্লেষিয়াছেন, নির্ব্বাণ সম্বন্ধে রামপ্রসাদের মত বর্ত্তমানকালের অনেক একেশ্বরবাদীদিগের সহিত মিলে, আত্মার নির্ব্বাণ অথবা ঈশ্বরপ্রাপ্তি তিনি বিশ্বাস করিতে নারাজ—মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া চিরদিন সেই বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারিলেই রামপ্রসাদ পরিতৃপ্ত। তাঁহার গানে আছে:

নির্ব্বাণ কি আছে ফল, জলেতে মিশায়ে জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি!

রামপ্রসাদ মা বৈ অন্য কিছু জানিতেন না।

হালি সহরে তাঁহার কোন স্মৃতিই নাই, একমাত্র গাব গাছটি ছাড়া—লোকেরা বলিয়া থাকে ঐটি সেই গাব গাছ। যাহাতে পদ্ম ফুল ফুটয়াছিল! সে গাছ দেখিয়া আমার জীবন ধন্য হইল, আমি প্রণাম করিলাম—স্পর্শ করিতেই আমার মধ্যে প্রাচীন এক তন্ময়তায় আমাকে অনেকক্ষণ যাবৎ মুগ্ধ রাখিয়াছিল!

অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত, খুব সাক্ষীর ন্যায় লিখিয়া গিয়াছেন, রামপ্রসাদ সেনের শক্তি ভক্তি বিষয়ক উক্তি সকল শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে কালীর বরপুত্র বলিয়া বাচ্য করিতেন। এবং তৎকালে তাবতেই বলিতেন, অন্নপূর্ণা প্রতি দিবসেই কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান শুনিতেন। রন্ধন করিয়া দিতেন, এ বিষয় অপর একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে, যথা এক দিবস রামপ্রসাদ সেন বাটির বেড়া বন্ধনের জন্য দড়ি বাঁশ বাঁখারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর-

অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ বাঁখারি দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসিগণ ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল যে, কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।

আমরা জানি, একদিকে মা তারা অন্য দিকে রামপ্রসাদ দুজনে মিলিয়া বেড়া বাঁধিয়াছিলেন—ইহাই সত্য! ঈশ্বরগুপ্ত পাছে দলেভারী আধুনিকরা সংস্কারাচ্ছন্ন বলে, তাই তাঁহার এই বিষয়ে লেখার মধ্যে শুষ্ক কর্ত্তব্য পরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই নাই: সব সময়েই তাঁহার মনে হইয়াছে মা কালীকে ভালবাসতে অর্থাৎ মূর্ত্তিকে যাহা মানুষের কল্পনামাত্র তাহা কেমন করিয়া সম্ভব! অথচ তিনি শাক্ত ছিলেন!

একদা একজন ঠাকুরের

শ্রীশ্রীমাকালী যে কে তাহা আমাদের ধারণাই যথার্থ নাই। ঠাকুর বলিয়াছেন, তিনি নানাভাবে লীলা করিতেছেন, তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী রক্ষাকালী শ্যামাকালী! মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না। নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করিতে ছিলেন।

মা কলিকাতা দেখিতেছেন, মা গঙ্গা দর্শন করিতেছেন, এই সত্য দেখিলাম সমস্ত জগতের বিশ্বজগতের প্রকৃতি হইয়া আমার অনুভব শক্তিকে সুদীর্ঘ আদি অন্তহীন করিয়াছে; অন্তরে বাহিরে তাঁহার দৃষ্টির কিরণ রশ্মি চারিদিকে ঝলমল! আশ্চর্য্য তখনও আমি আছি, আমার পূর্ব্বতন সংস্কার, লালকে লাল কালোকে কালো বলা তাহা, এখনও বর্ত্তমান! আমি নির্ঘাৎ ভয় পাইয়াছি, এই মহাকালী যিনি কালের সহচরী—যিনি নিরাকারা! আমি কোথাও নির্ঘাৎ স্থির থাকিতে চাহিয়াছি, মন বলিয়াছে তুমি জপ কর।

শ্রীশ্রীমাঠাকরুণ সারদামণী বলিলেন, জপাৎ সিদ্ধি! অন্তত দশবার ইষ্ট মন্ত্র জপ কর।

ঠাকুর বলিয়াছেন, শ্যামাকালী অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী গৃহস্থ বাড়ীতে তাঁহারই পূজা হয়। যখন মহামারী দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি

হয় তখন রক্ষাকালীর পূজা করিতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ!

এবং ইহাতে আমি পশ্চাত হাটিতে থাকিলাম; শেষেতে, এমন এক স্থানে পৌছিলাম যখন অনুমান হইল আর পথ নাই, কেমন একরূপ উত্তাপ লাগিতে আছে, পশ্চাত ফিরিয়া অবলোকনিয়া প্রত্যক্ষিলাম, ইহা সেই ঘটনা! বামাক্ষ্যাপা বসিয়া আছেন, স্থান বর্দ্ধমানের সন্নিকটে, কাঞ্চন নগরের দিকের এক শ্মশান! এক ব্যক্তি কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া নিকটে বসিয়াছিল, আর মহাসাধকের মাতৃনামের মধ্যে বলিতেছিল, বাবা আমার কি হইবে? মহাসাধক দয়া পরবশ হইয়া বলিলেন, যাও অমুক শ্মশানে এক যুবতী রমণীর শবদাহ এখনই হইবে, শবযাত্রীরা চিতায় অগ্নি প্রদান করত অন্যত্র যাইবে, তুমি ঐ স্থানে পৌছিয়া দেখিবে, চিতা জলিতেছে রমণীর বাম পদ চিতা ছাড়িয়া বাহিরে প্রসারিত, ঐ পদ টানিলেই দেহ ছাড়া হইবে, ঐ পদটি বাম স্কন্ধে বহিয়া লইয়া আইস! ঐ ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা অনুযায়ী সেই স্থানে গিয়া প্রজ্বলিত চিতার বাহিরে বাম পদ দেখিল, যাহা হইতে—দেহগত জলীয় অংশ ফুট কাটিয়া বিশীর্ণ রেখায় ঝরিতেছে, ধূম নির্গতমান।

সে সময়ক্ষেপ না করিয়া সেই পদখানি টানিয়া লইল, এবং আপন বাম স্কন্ধে সেই বিবট পদ খানি স্থাপন করিয়া রাতের গূঢ় অন্ধকারে চলিতে আরম্ভ করিল, সে দেখিল কয়েকটি শিবা তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, দুর্গানাম করিতে থাকিয়া মহাসাধকের নিকট পৌছাইল। তিনি কহিলেন, তোর হইবে! বলিয়া ঐ অর্দ্ধদগ্ধ পদ হইতে তিলমাত্র প্রসাদ লইয়া নিজ মুখে দিয়া তাহা ঐ ব্যক্তিকে দিলেন। নর বসার গন্ধ ব্যক্তির মধ্যে ঝটকা মারিল তথাপি সে ভক্তি-ভরে গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে মহাসাধক আজ্ঞা করিলেন, যাও এইবার বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া আইস! এখনও রাত আছে, কল্য দ্বিপ্রহরের মধ্যে ফিরিয়া আসিস। ঐ ব্যক্তির বাড়ী অমুক গ্রাম বর্দ্ধমানের নিকট, এবং তাহার এক দিদির বর্দ্ধমান শহরেই বাড়ী! তাই সে প্রথমে দিদির বাড়ীতেই গেল, তখন ভোর হয় নাই—বাহির বাড়ীর উঠানে সে বসিয়াছিল; ভোর হইতে দিদি চাকরাণীসহ বাহির বাড়ীতে আসিতেই ভাইকে দেখিয়া স্তম্ভিত—কহিলেন, একি তোর সব চুল পাকা হইল কি করিয়া? সে উত্তর করিল, তাহা ত জানি না, হবে বোধ হয়। দিদি তাহার কথা বলিবার রকম বুঝিয়া জানিতে চাহিলেন,

তোর কি হইয়াছে বল ত, চল ভিতরে চল। সে কহিল, না দিদি ভিতরে আর যাইব না, তোকে প্রণাম করিতে আসিলাম, আমি সন্ন্যাসী হইব! আমি আর দাঁড়াইব না, বাড়ী যাইব। বলিয়া ইষ্টিশানের দিকে গেল; সকালের গাড়ী ধরিল; কামরায় বসিল; কয়েকটি ইষ্টিশানের পরই অমুক গ্রাম! গন্তব্যস্থল আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকার পর যখন দেখিল, গাড়ী ইষ্টিশান ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে লাফ দিল, লাইনের নিকটে যে লৌহ পোষ্ট থাকে, তাহাতে মাথা লাগিয়া একেবারে নীচে পড়িল। তখনই তাহার মৃত্যু হইল।

আমি ইহা স্মরিয়াছি মাত্র, এবং নিজেরে প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এই আখ্যান না ত্রৈলোক্যবাবুর পরিহাস, আমার পথরোধ করে নাই। আমার জিহ্বায় ১০৮ শ্মশানের মৃত্তিকার স্বাদ আছে।

ঠাকুর বলিলেন, নরবসার গন্ধ এত সুন্দর যে টানিয়া লইতাম।

আমিও নরবসার গন্ধ সুন্দর বলিব।

ঠাকুর বলিয়াছেন যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন সৃষ্টির বীজ সকল মা কুড়াইয়া রাখিয়া দেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা ক্যাঁতারহাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিষ তুলিয়া রাখেন। হ্যাঁগা গিন্নীদের ঐ রকম একটি হাঁড়ি থাকে, ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুটলি বাঁধা শশাবীচি, কুমড়োর বীচি, লাউ বীচি এই সব থাকে। দরকার হইলে বাহির করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম বীজ সব কুড়াইয়া রাখেন! সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যেই থাকেন। বেদে আছে উর্ণনাভের কথা, মাকড়সা আর তাহার জাল। মাকড়সা ভিতর হইতে জাল বার করে, আবার নিজেই সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই!

শ্যামাকালী। যে মা কালীর সমক্ষে আমরা গান গাহিয়া থাকি, 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল তোর পায়', যে মাকে আমরা জবা ছাড়াও নির্ভাবনায় অন্য ফুলে সাজাইতে পারি, কিন্তু মধ্যরাত যখন আসে—সেই হিম পড়া রাত্রে, মায়ের নিকটে বসিতে কেমন যেন অভূতপূর্ব্ব চৈতন্য হয়, ঐ মা হাসিতেছেন; মার আরতি হইতেছে, প্রদীপের আলো মায়ের হাতে হইতে হাত পড়িতেছে। ইতিমধ্যে ঐ আলুলায়িত কেশে মা জগজ্জননী ক্রমশ আমাদের নিকট প্রকট

হইতেছেন। ত্রিনয়ন করুণায় উপছাইয়া উঠিয়াছে। কি শান্ত কি বা সন্তান বৎসলা!

ভাগ্যবান মথুরকে ঠাকুর একদা কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ রূপ দেখাইলেন। মথুরঠাকুরের এই রূপ প্রত্যক্ষিয়া, ঠাকুরের পদদ্বয় জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঠাকুর কহিলেন, একি করিতেছ; মথুর উত্তর করিল, বাবা তুমি বেড়াইতেছ আর আমি স্পষ্ট দেখিলাম, যখন তুমি সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতেছ, তখন দেখি তুমি নহ, ঐ মন্দিরের মা ভবতারিণী। আর যেইমাত্র পিছন ফিরিয়া পুনঃ চলিতে আরম্ভ করিলে—দেখিলাম সাক্ষাৎ মহাদেব!

ভক্তেরাও ঠাকুরের ঐ রূপ দেখিয়াছিল।

শ্যামপুকুরের বাড়ী, ঠাকুরের আজ্ঞা মত কালী পূজার আয়োজন হইল। ঠাকুর বসিয়া আছেন, ধূপদীপ জ্বলিতেছে, ভক্তরা সকলে নিকটেই আছেন, গিরিশচন্দ্রর মনে কেমন উদয় হইল, ঠাকুর যদি পূজাই করিবেন তবে এমনভাবে বসিয়া আছেন কেন?—পরক্ষণেই তাঁহার হৃদয়ে এক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল এবং তখনই ভক্তভৈরব, জয় মা! বলিয়া সচন্দন ফুল লইয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে বারম্বার অর্ঘ্য দিতে লাগিলেন, সেইসঙ্গে অন্যদের চৈতন্য হইল—তাহারাও, জয় মা! বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে ফুল দিতে থাকিল। ঠাকুর রোমাঞ্চিত হইয়া সমাধিময় হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখ ও দেহ হইতে এক অলৌকিক জ্যোতি বিকিরণ হইতে লাগিল, অধরে দিব্য হাস্য, দুইটি হস্ত বরাভয় মুদ্রা ধারণে, তাহাতে, শ্রীশ্রীজগজ্জননীর আবেশের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সকলেই দেখিল, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রতিমা ঠাকুরের দেহে প্রতিভাত হইতে আছে।

এবং ঠাকুর যেদিন আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান, মাঠাকুরাণী পার্শ্বের কক্ষ হইতে কাঁদিতে থাকিয়া, 'আমার মা কালী কোথায় গেলে গো' এই কথা বারম্বার উচ্চারিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

তাহারা আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী, টাই-এর গ্রন্থিতে অঙ্গুলি প্রদান করত স্বীয় মানসিকতায় ভরসা করিল। ইহাদের, কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বে গাছ পাতা, আকাশ, ছুটাছুটি কোন কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় না; ইহারা আরব্য সাগরে ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেট ফেলিয়াছে, ভূমধ্যসাগরে চকলেটের রাঙতা এবং আ টল্যান্টিকে

নিজেদের নাম কাগজে লিখিয়া বোতল জাত করত কাসাব্লাঙ্কা হইতে নিক্ষেপিয়াছে কহিল, ওহে বন্ধু তোমাকে আমি ইহার পরিচয় দিতেছি; ইনি ডাক্তার। তোমার সম্পর্কে ইহারে বলিয়াছি।

ও ডাক্তার, আপনি কত নিখুঁত, আপনি খুব নিক্তিক, এই দেহকে জানিয়া লইয়াছেন। আপনাকে লোকে দেবতা বলে, আপনি খুসী হইয়া থাকেন! আপনি কি আমার এই দিবানিশিকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন! ডাক্তার আমার চোখ দেখিলেন, কহিলেন, ইহা আর একরূপ হইয়াছে।

ঠাকুর আমার ব্যাকুলতায় আমার দৃষ্টির ঘ্রাণ শক্তি হউক, আমি পদ্মগন্ধ লভিব।

ঠাকুর আমার ডাকে, আমার দৃষ্টির শ্রবণ শক্তি হউক, আমি বাঁশরী ধ্বনি শুনিব, নূপুরধ্বনিতে হাত বুলাইব।

ঠাকুর আমার তোমার জন্য অস্থিরতায়, আমার দৃষ্টির স্পর্শক্ষমতা হউক, আমি পদদ্বয় ছুঁইব।

ঠাকুর আমার মধ্যে তোমার জন্য বিল্লি আঁচ ড়ানিতে—আমার দৃষ্টির জিহ্বা হউক, আমি যে পদধূলি লইব।

আমি ডুবেলা শুধু ডুবার নাম করি, আমার বুক চিতাইয়া উঠে! আবার তোমার কথা শুনিয়া আমি ভীত হই—তোমার ভগবৎ সাধনা আমাকে সুবিশাল লবণ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে; তোমার ভগবৎ প্রেমে বিরহ তাপে তোমার গাত্রের প্রলেপকৃত মৃত্তিকা জলিয়া গিয়াছে! আমি ইহা শোনামাত্রই জলবিন্দু ধূলিকণা কখনও যে স্ফুলিঙ্গ হইতে অভিলষিয়াছি! তুমি বলিয়াছ, কৃষ্ণ বিরহে তাপিত সনাতন যে গাছের তলায় বসিতেন সেই গাছের পাতা জলিয়া যাইত।

অহো সনাতন!

আমরা ছেলেবেলায় কি মায়াময় সুর করত রবিঠাকুরের সেই 'নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে' আবৃত্তিয়াছি, ঐ কবিতার শেষ দুই লাইন আমাকে বড় মন্ত্রমুগ্ধ করিত, যে ধনে হইয়া ধনী, মনিরে মান না মুনি, তাহারই খানিক মাগি আমি নত শীরে এত বলি নদী নীরে ফেলিল মাণিক।'

সত্যই সনাতন একজন বটে, যিনি কৃষ্ণকে ধমক পর্য্যন্ত দিতেন; জানিয়াছি কৃষ্ণ ইঁহাকে বড় সমীহ করিত, ছেলেমানুষ বেচারী ভাবিত সনাতন ছাড়া আমার

কে আছে। এমন ভালবাসা আর কোথায় পাইব? এই গোপাল, মদনমোহন ছিলেন চৌবেদের ঘরে।

সনাতন মাধুকরী করিতে গিয়া মথুরাবাসী চৌবের গৃহে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নেহারিলেন, চৌবে গৃহিণী ছেলেদের খাইতে বসাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে মদনমোহনকে ভাত দিয়াছে—ইহা দেখিয়া ভক্ত সনাতন রোমাঞ্চিত হইলেন এমন দৃশ্য কখনও দেখেন নাই; মদনমোহন মহা আহ্লাদে ছেলেদের সহিত খাইতেছে—কোন আচার নাই বিচার নাই।

ঠিক এমনটি একবার মহাযোগিনী গৌরী মার ভাগ্যে সাক্ষাৎ ঘটে। গৌরীমা তীর্থ করিতে দ্বারকায় গিয়াছেন, দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর মূর্ত্তি অতীব মনোহর দেখিলে চৈতন্য হয়, মন্দিরে প্রাঙ্গণে গৌরীমা যখন প্রবেশ করিলেন, সেই সময় ভোগারতি সবে শেষ হইল, নাট মন্দিরে বসিয়া যোগিনী জপ করিতেছিলেন, দেখিতে পাইলেন মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি জগজনচিতচোরা শ্যামসুন্দর বালক আহারান্তে মুখ না ধুইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। যোগিনী মীমাংসা করিলেন, এদেশে পুরোহিতের ছেলেদের মন্দিরের মধ্যে প্রসাদ গ্রহণ করা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়—তবু তাঁহার দারুণ আচার নিষ্ঠ মন ঐ ব্যাপার মানিতে পারিল না। পরক্ষণেই দেখিলেন, পুরোহিত আসিয়া সস্নেহে সেই শ্যাম বালকের মুখ হাত পা ধোয়াইয়া মুছিয়া দিলেন এবং আরও আশ্চর্য্য যে, তাহার পরেই বালক মন্দিরের সিংহাসনে উঠিলেন! যোগিনী মা তদ্দর্শনে কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পুরোহিত সত্বর আসিয়া জিজ্ঞাসিল, কিছু দর্শন হইয়াছে মা?

সনাতন হাত জোড় করিয়া চৌবে গৃহিণীর স্তবন করিয়া কহিলেন, মাগো তুমি যেমন সেবা করিতেছ এমনই করিবে—আমরা আসিয়া দেখিব! চৌবে গৃহিণী উত্তর করিলেন, 'তেঁহ কহে ভাল ভাল তাহাই করিব। দিন চলি যায় আচার করিতে নারিব॥' অতঃপর সনাতন নিবেদিলেন, মাধুকরী তুমি আমায়, তোমার শিশুর এই পাত্র-অবশিষ্ট দিয়া আমায় ধন্য কর। এবং সেইদিন রাত্রে মদনমোহন সনাতনের কাছে আবদার করিলেন, তুমি আমায় চৌবের ঘর হইতে লইয়া এস। 'সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পানি।' পরদিবস সনাতন প্রাতে চৌবের গৃহে গমন করিয়া সেই কথা বলিলেন।

চৌবের গৃহিণী ক্রন্দিত চোখে বলিয়াছিলেন, আমিও একই আদেশ পাইয়াছি যে তোমার কাছে মদনমোহন যাইতে চাহেন,—তিনি যখন চাহেন তাহাই হইবে। এবং তৎসহ কৃষ্ণের স্বভাব যে কত পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর তাহা বর্ণনা

করিলেন, শেষে বলিলেন, 'যদ্যপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি। বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনায় ডারি॥' কিন্তু মদনমোহনকে ছাড়িতেই হইবে।

এবং চৌবে গৃহিণী সনাতনকে মদনমোহন দিলেন।

সনাতন সূর্য্যঘাটের কাছে এক টিনায় লতা শাখা শুষ্কতৃণাদি যোগাড় করিয়া এক ঝোপড়া বান্ধিয়া তাহাতে মদনমোহনকে বসাইলেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা পান তাহা রান্ধিয়া মদনমোহনকে নিবেদন করেন। এমন করিয়া কয়েকদিনের পর মদনমোহন অতিষ্ঠ হইয়া সনাতনকে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, লবণ ছাড়া যে আমি খাইতে পারি না, ভোগে তুমি লবণ দিবে।

সনাতন শুনিয়া মহারাগান্বিত হওয়ত প্রকাশিলেন, বাঃ আজ তুমি লবণ না হইলে বলিতেছ খাইতে পারি না, কল্য বলিবে রুক্ষ আটা খাইতে পারি না, তারপর বলিবে শর্করা চাই ঘৃত চাই—এসব আমি কোথায় পাইব, আমি সন্ন্যাসী বিষয়ীদের বাড়ীতে গিয়া তোমার জন্যে ঐ সব মাগিতে পারিব না—নিজে যদি পার ত ব্যবস্থা করিয়া লহ।

কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমে মত্ত এই সেই সনাতন! যিনি কৃষ্ণে সমস্ত কিছু সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পথ বড় কঠিন অতীব সূক্ষ্ম! অহৈতুকী ভক্তিতেই কৃষ্ণ তাঁহার লাভ হইয়াছে।

এইরূপ আছে যে, নরোত্তম ঠাকুর সনাতনের আশ্রয় চাহিলেন; নরোত্তম রাজপুত্র, কৃষ্ণে তাহার অচলাভক্তি; সনাতন নরোত্তমের কথা শুনিয়া কহিলেন, দেখ তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, তুমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। নরোত্তম সনাতনকে কহিলেন, প্রভু আমি কৃষ্ণসাৎ হইতে চাহি, আমার দেহমন সব তাঁহার ইহা একমাত্র আপনি করিয়া দিতে পারেন, আপনি বিমুখ হইবেন না।

সনাতন পুনঃ বলিলেন, তোমার, সময় হয় নাই! নরোত্তম কান্দিয়া বিনীত কণ্ঠে নিবেদিলেন, প্রভু আমাকে ত্যাগ করিবেন না, আমি সংসার বিরক্ত—আমি পুনঃ সেখানে যদি, যাই পতিত হইব, আমায় ত্যাগ করিবেন না!

সনাতন, নরোত্তম দাসের ক্রন্দনে দ্রবীভূত হইলেন, আজ্ঞা দিলেন, ঐ কলস ভরিয়া জল লইয়া আসিয়া ঐস্থানে ঢালিতে থাক এই তোমার কাজ! নরোত্তম যমুনা হইতে কলসে জল ভরিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঢালিতে লাগিলেন, সারাদিন রাত তাঁহার মাথা হইতে কলস নামিত না, মাথায় জটা পড়িয়াছিল, এবং অনবরত জলের সংস্পর্শে তাহাতে একরূপ পোকা সারা জটাতে ভরিয়া যায়; নরোত্তমের কোন লক্ষ্যই নাই। বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে।

তখন গ্রীষ্মকাল, বৃন্দাবনের গ্রীষ্ম নিদারুণ ক্লেশদায়ক; লুতে—উত্তপ্ত বায়ুতে বৃক্ষের পত্ররাজি শুকাইয়া যায়; মাটিতে পা দেওয়া যায় না, ঠিক এইরূপ এক দিবসে হঠাৎ এক সন্ন্যাসী দ্বিপ্রহরে জল জল বলিয়া সনাতনের প্রায় নিকটে আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন; সনাতন স্তব্ধভাবে বসিয়াছেন, এমন সময় নরোত্তম মাথায় কলস লইয়া সেখানে উপস্থিত! নরোত্তম ঐ সন্ন্যাসীর গোঙানিতে স্থির থাকিতে পারিলেন না। জলদানে সন্ন্যাসীর তৃষ্ণা মিটাইলেন।

সন্ন্যাসীর জল পান শেষ হইতে সনাতন নরোত্তমকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, নরোত্তম তুমি এখনই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তোমার দ্বারা সমর্পণ সম্ভব নহে।

নরোত্তম ডাক ছাড়িয়া কান্দিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না।

এই সত্য যখন প্রথম আমি শুনি, তখন কি ভাবে যে আকাশে আমার মুখ কে যেন ধরিয়া রগড়াইয়া দিল, আমি একি! একি! শব্দে চীৎকারিয়া উঠিলাম, আমার কি ভয়ঙ্কর দুঃসাহস আমি প্রতিবাদ করিলাম! হায় কি পাপ করিলাম। রাত্রে খাটে বসিয়া ভাবিয়াছিলাম, বাপরে একি নির্ম্মম পদ্ধতি!

আমার ইচ্ছা হইল এই মুহূর্ত্তে ইউরোপের কোন শহরে চলিয়া যাই। যাহারা ডাক্তার লইয়া আসিয়াছিল তাহাদের এমন মানসিকতার লক্ষণ আমি কখনও বলি নাই, শুধু গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া এই ভাবিয়াছি; আমার এইটুকু আমি কি বিরাট প্রতিবন্ধক। আমি ধীরে ঐ গীত গাহি, 'চল মন বেড়াতে যাবি, কল্পতরুমূলে চারিফুল কুড়ায়ে পাবি।' আমি জানি তিনি দেখা দেন।

নাগাজীর ভগবৎদর্শনের পুণ্য কথা সন্তদাস বাবাজী বলিয়াছেন, নাগাজী কদমখণ্ডীতে বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন, কিন্তু ভগবৎ দর্শন হইল না; তখন তিনি মহা অভিমানে ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের প্রকৃতগত সখ্যভাব, নাগাজীর ও তাহাই ছিল; তিনি বিচারিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই স্থানে সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব অন্য কেহ সিদ্ধ হউক ইহা সে চাহে না। আমার এ স্থান ত্যাগই শ্রেয়, দেখি অন্যত্রে সে আমায় কিরূপে বাধা দেয়।

সখার প্রতি এহেন অভিমানে, নাগাজী চিমটা কমণ্ডলু লইয়া এই স্থান ত্যজিয়া যাইতে কয়েকপদ গমন করিলেন, যে পথে যাইতেছিলেন সেখানে একটি কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ ছিল—যখনই উহার নিম্নে আসিয়া অগ্রসর হইবার নিমিত্ত পদক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন তাঁহার যাইবার শক্তি নাই, তাঁহার বিরাট জটাসকল

সেই বৃক্ষের কাঁটায় এমনভাবে জড়াইয়া যায় যে, তাহাতে তাঁহার চলিবার সমর্থ রহিত হইল।

তিনি আরও ক্ষুব্ধ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা সেই শঠেরই চাতুরী! আমি এই স্থান ত্যজিয়া যাইতেছি তাহাও সহ্য হইতেছে না, বেশ আমি এই কণ্টকবিদ্ধ অবস্থায় চিরদিন থাকিব। এইরূপে একদিন দুইদিন, তিনদিন নাগাজী এতটুকু নড়িবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যখন করিলেন না তখন হঠাৎ ভক্তবৎসল ভগবান চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইয়া নাগাজীকে আলিঙ্গন করিয়া, কণ্টক সকল হইতে তাঁহার জটা মুক্ত করত কহিলেন, নাগাজী তুমি এইখানে থাক। তুমি সিদ্ধ হইয়াছ।

দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র নির্ব্বাসিত হইয়া আগ্রা জেলে কি রূপে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও সর্ব্বত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ব্রাহ্ম সমাজের ছাত্র সমাজে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যখন উত্তরপাড়ায় সেই কথাই বলিয়াছেন—পুণার ইণ্ডিয়ান সোশাল রিফর্মর (সমাজ সংস্কারক) উপহাস করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি জেলে ঈশ্বর দর্শনের ছড়াছড়ি হইতেছে। উপহাসের অর্থ এই যে, এই সব কথা মাথা পাগলা লোকের কল্পনা অথবা মিথ্যাবাদীর বুজরুকী। অথচ অরবিন্দবাবু যাহা বলিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র অবিকল তাহাই বলিয়াছেন। এমন কি যাহা অনেকের পরিহাসের যোগ্য কথা বোধ হইয়াছে, বিচারক ও জেলরের মধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপী প্রেমময় ও দয়াময় দর্শন, তাহাও দুজনেই লাভ করিয়াছেন! অবশ্য একই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দুইপ্রকার তার্কিক সিদ্ধান্ত হইতে পারে, এক সত্য লইয়া নানা মত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আগ্রায় ও আলিপুরে, যাহাদের ভিন্ন মত ও ভিন্ন প্রকৃতি সেই রূপ দুইটি লোকের একই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছে, তখন কি কেহ তাহাকে পাগলামী বা বুজরুকী বলিতে পারে? পুণার সমাজ সংস্কারক এর মতে, ভগবান কখনও প্রত্যক্ষ দর্শন দেন না, তিনি নিয়মের অন্তরালে থাকেন, আমরা প্রকৃতির নিয়ম অনুভব করিতে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করা বাতুলের কথা। একজন বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ লোক যদি বলেন, যে অমুক রাসায়নিক প্রয়োগ মিথ্যা এবং কয়েকজন বিজ্ঞানবিদ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া করিয়া বলেন, ইহা সত্য আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কাহার কথা অধিক বিশ্বাস যোগ্য—কাহার মত লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য?

যাহাদের ভগবৎ কথায় মন নাই ঠাকুর বলিতেন, যাও বিল্ডিং দেখ গিয়া।

আমাকে অহরহ সনাতনের ঐ আজ্ঞা একটি ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য হইয়া আমার পথ রোধ করে।

এইরূপ লোকের আর এক অবিশ্বাসের কারণ এই যে জেল অপবিত্র স্থান, খুনী চোর ডাকাতে পরিপূর্ণ, যদিও ভগবান দর্শন দেন, তবে পবিত্রস্থানে সাধু সন্ন্যাসীকেই দর্শন দিবেন, আইনের জালে পতিত রাজনীতিককে, ঘোর রাজসিক কার্য্যে লিপ্ত সংসারীকে জেলে দেখা দিবেন কেন? আমাদের মত সাধু সন্ন্যাসী অপেক্ষা এইরূপ লোককেই ভগবান সহজে ধরা দেন, আশ্রম ও মন্দির অপেক্ষা জেলে বা বধ্যভূমিতে ভগবদ্দর্শনের ছড়াছড়ি হইবার কথা। যাঁহারা মানব জাতির জন্য, দেশের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা ভগবানের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, যে দুঃখীকে সান্ত্বনা, দরিদ্রকে সাহায্য, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, নিরুপায়কে উপায় দেয়, সে আমাকেই দেয়, আমি সেই দুঃখী, সেই দরিদ্র, সেই তৃষ্ণার্ত্ত, সেই নিরুপায়। আবার জেলে অহঙ্কার সম্পূর্ণ চলিয়া যায়। সেইখানে লেশমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, ভগবানের মুখের পানে আহার, নিদ্রা, সুখ, ভাগ্য, স্বাধীনতার জন্য চাহিতেই হয়। অতএব এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্ভর, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ যেমন সহজ আর কোথাও তেমন সহজ নহে। কর্ম্মীর আত্মসমর্পণ ভগবানের অতিপ্রিয় উপহার, এই পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, এই বলিই শ্রেষ্ঠ বলি। ইহাতে যদি ভগবদ্দর্শন না হয়, তবে কিসে হইবে!

রামকৃষ্ণপদাশ্রিত লাটু মহারাজ বলিলেন, ভগবান ভিতরে বাহিরে সব জায়গায়ই সাধনার স্থান করিয়া রাখিয়াছেন।

আদত কথা অহেতুকী ভালবাসা এবং তাই ঠাকুর ডাকিতেন:

মাগো আমি লোকের নিকট সম্মান চাই না। শারীরিক সুখ চাই না।
গঙ্গাযমুনার চিরসঙ্গমস্থল তোমার নিকট আমার আত্মা উড়িয়া যাক।
মা আমার যোগ নাই, ভক্তি নাই, আমি দীন ও বন্ধুহীন।
আমি কাহারও প্রশংসা চাই না।
আমার মন তোমার পাদপদ্মে বাস করুক!

পেট্রনযুগের সাহিত্য ও সাহিত্যিক

বিনয় ঘোষ

পেট্রনযুগের শেষ হয়নি আজও, যদিও সামাজিক ইতিহাসের প্রচলিত হিসাবমতো তার শেষ হবার কথা। রাজারানী বাদশাবেগম সামন্ত-জমিদারদের সেকালের পোশাকপরিচ্ছদে আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাঁরা নতুন পোশাকে, নতুন নামে ইতিহাসের মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সাহিত্যিকশিল্পীদের সামনে নানারকমের পোষকতার প্রলোভন তুলে ধরেছেন। যেদিন থেকে আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতির লোকায়ত স্তর ছেড়ে উপরের সুসভ্য স্তরে উঠেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্য-সাহিত্যিক-শিল্পীদের আত্মবিকাশের ইতিহাস অনেকাংশে পেট্রনদের পোষকতা—পিঠচাপড়ানির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সাহিত্যিকদের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা নিশ্চয় এযুগে আছে, কিন্তু তার অনেকটাই পৌরাণিক অতিকথার মতো মিথ্যা অথবা অর্ধসত্য।

একথা ঠিক যে কোনো মহাফেজখানায় আজকাল কোনো রাজামহারাজার তায়দাদ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা থেকে জানা যাবে যে অমুক কবি-সাহিত্যিক, অমুক পণ্ডিত রাজা হবুচন্দ্রের কাছ থেকে এতবিঘে নিষ্কর জমি পেয়েছেন, মাসিক বৃত্তি পেয়েছেন। তার কারণ, সমাজের পরিবর্তনের ফলে পেট্রনদের আকৃতি-প্রকৃতি বদলেছে। তাঁরা রাজনৈতিক পার্টির নেতা হিসেবে, সর্বশক্তিমান 'গণতান্ত্রিক' শাসক হিসেবে, অথবা বহুজনপ্রিয় সংবাদপত্র-পত্রিকার একচ্ছত্র মালিক-পরিচালকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের মুখে হাসি ও বড় বড় বুলি, একহাতে স্বাধীনতার বাতি, অন্যহাতে নানারকমের প্রাইজ, স্বীকৃতি, চাকরি, প্রমোশন, পাবলিসিটি ইত্যাদি। এগুলি তায়দাদের ভূমিদানপত্র নয়, বৃত্তিও নয়, অথচ তার চাইতেও শক্তিশালী পোষকতার হাতিয়ার। একথা মনে রেখে সেকালের পেট্রনযুগের মাহাত্ম্যের কথা পাঠকরা পড়বেন।

চমপ্রদ ইতিহাস এই পেট্রন প্রকাশক ও পাঠকের। সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সমাজের একদিকে লেখক, অন্যদিকে তাঁর পেট্রন, প্রকাশক ও পাঠক—এই হল সাহিত্যের একটা অন্যতম প্রধান দিক। সাহিত্যের ভাবধারা, সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী ও ভাষা ইত্যাদি নিয়ে যে সাহিত্যের ইতিহাস,

তার সঙ্গে লেখক ও পেট্রন-পাঠক-প্রকাশকের এই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যুগে-যুগে পেট্রনের মর্জি অনুযায়ী সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহ পেট্রনরা যখন আধুনিকযুগের প্রকাশক-পেট্রনে পরিণত হয়েছেন, তখন প্রকাশকরাও নানাভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বর্তমানে প্রকাশক-পেট্রনের যুগ থেকে আমরা ধীরে ধীরে পাঠক-পেট্রনদের যুগে উত্তীর্ণ হচ্ছি এবং সাহিত্যের ধারারও যুগোপযোগী পরিবর্তন হচ্ছে। পেট্রনদের মর্জি, প্রকাশকের রুচি থেকে আমরা পাঠকের দাবির যুগে পৌঁচেছি। সাহিত্যের ইতিহাসের এও একটা দিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশ্বসাহিত্যের যেমন, আমাদের বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি।

শুশ্‌কিং বলেছেন যে, অতীত যুগের সাহিত্যের ইতিহাস হল প্রধানত রাজা-রাজড়া ও অভিজাত 'অ্যারিস্তোক্রাটদের' কৃপা ও পোষকতার ইতিহাস।[১] রুচি যোগাতেন যিনি রুচিরও কর্তা ছিলেন তিনি—সাহিত্যের রুচি, শিক্ষার রুচি, শিল্পকলার রুচি। সমাজ বলতে তাঁদেরই বোঝাত, রাজা-বাদশাহের, সামন্ত-প্রভুদের, জমিদার-জায়গীরদারদের, আমীর-অমাত্যদের সমাজ। সাহিত্যিকরা দুনিয়াটাকে দেখতেন বাদশাহী চশমার ভিতর দিয়ে। সাধারণ মানুষ সিলুয়েট মূর্তির মতো দিগন্তরেখায় ভেসে উঠত উদাসীন ও নিষ্ঠুর মধ্যযুগের আকাশের তলায়। কোনো মমতাবোধ ছিল না মানুষের প্রতি বা জীবনের প্রতি। সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলার মতো সাহিত্যও ছিল দরবারী সাহিত্য, প্রধানত দরবারী মেজাজ ও রুচি পরিতৃপ্তির জন্য।

ঐতিহ্য সহজে মরে না, দীর্ঘকাল বেঁচে-থাকে, মানুষের অজ্ঞাতসারে। মানুষের মতো সমাজেরও একটা অবচেতন সত্তা আছে। সেই অবচেতন সত্তার আলো-অন্ধকারে অতীতের সব মৃত অভ্যাস ও আচার উঁকি-ঝুঁকি মারে, নিয়মিত হানা দেয় গোরস্থানের প্রেতাত্মাদের মতো। দীর্ঘকাল যে আমরা, সাহিত্যিকরা ও শিল্পীরা, রাজদরবারের বদান্যতার ছায়াতলে মানুষ হয়েছি, তা আজও আমরা ভুলতে পারিনি। টিউটন যুগের সূতরা (Court singer) আজও 'লরিয়েট্ কবি'র মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। রাজকীয় সম্মান, পদবী ও পুরস্কারে আজও যে-সব সাহিত্যিক ও শিল্পীকে ভূষিত করা হয়, তাঁরা তাঁদের রচিত সাহিত্য-শিল্পে প্রজার চেয়ে রাজার রুচির খোরাক যোগান বেশি। তর্ক করে একথা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

১. L. L. Schucking: *The Sociology of Literary Taste*., London, 1945, Ch. 2.

টিউটন যুগের দরবারী গীতকারদের 'স্কপ' (Scop) বলা হত। স্কপরা রাজা-রাজড়াদের গুণগান করতেন, কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করতেন আবৃত্তি করে। আমাদের দেশের এই কবি-গায়কদের 'সূত' বলত। বাহ্যত তাঁরা আইরিশ 'ফাইল' (File) ও টিউটন 'স্কপদের' মতো ছিলেন। মনে হয় যেন ওডেসিউসের ফিমিওসের মতো, আলকিন্সের কোর্টের ডিমোডোকোসের মতো, তাঁদের সঙ্গে পেট্রনদের সম্পর্ক ছিল। আগামেমনন একবার তাঁর রানীকে পর্যন্ত কোর্ট-গায়কের অভিভাবকত্বে রেখে গিয়েছিলেন এবং ডিমোডোকোসকে একস্থানে 'লর্ড' পর্যন্ত বলা হয়েছে। টিউটন স্কপরাও রাজার কাছ থেকে বৃত্তি পেতেন এবং পেট্রনরা তাঁদের একেবারে দাসানুদাস মনে করতেন না। ভারতীয় সূতরাও বৃত্তি পেতেন, রাজদরবারে সম্মানও পেতেন, কিন্তু তবু তাঁদের পদমর্যাদা অতটা উন্নত ছিল কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভারতীয় সূতরা অনেকটা পেশাদার স্তাবক ও ক্লাউনের মতো ছিলেন। ইয়োরোপীয় সূতরা যে তা ছিলেন না তা নয়। তাঁরাও তাই ছিলেন; তবে স্বতন্ত্র পরিবেশে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ত অপেক্ষাকৃত কিছু উন্নত ছিল। সাধারণত বীরগাথা ও কীর্তিকাহিনী সূতরা গাইতেন। ঋগ্বেদেও এরকম কাহিনী আছে। ত্রিৎসু রাজা সুদাসের দশজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করার কাহিনী আছে (ঋগ্বেদ, সপ্তম : ১৮), দিবোদাস কর্তৃক সম্বরের পরাজয়ের কথা আছে (প্রথম : ১১২, ১১৬, ১১৯ ইত্যাদি)। এগুলিকে বীরগাথা বলা যায়। সূতরাই মুখে মুখে গাইতেন নিশ্চয়। শতপথব্রাহ্মণে আরও ভালভাবে আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের এক বর্ণনা প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণরা গান করবেন দিনে, রাজন্যরা রাতে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ত্রয়োদশ : ১. ৫, ৬), ব্রাহ্মণ গায়করা দানধ্যানের গুণগান করবেন, রাজন্যরা যুদ্ধবিগ্রহ ও জয়ের গান করবেন। রাজা ও পুরোহিত যখন যজ্ঞাসনে বসবেন তখন অধ্বর্যু আহ্বান করবেন হোতাকে আবৃত্তি করতে। সূতদের জাতি ও মর্যাদার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে শতপথব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ সূত ও ক্ষত্রিয় সূতের কর্তব্যও পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সূত দানধ্যানের ফিরিস্তি দিয়ে দাতার মহিমা কীর্তন করবেন, আর ক্ষত্রিয় সূত বীরগাথা গেয়ে বীরের গুণগান করবেন। প্রত্যেকে নিজের পেশার গুণকীর্তন করতেন, পরিষ্কার বোঝা যায়। বৈদিক যুগের প্রথম পর্বের সামাজিক অবস্থায় তাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল, সূতদের স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণী তখনও গড়ে ওঠেনি। ভারতের আদি কবিরা তখনও রাজদরবারের মুখাপেক্ষী

হয়ে ওঠেন নি। ব্রাহ্মণ সূতদের দানমাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্যে রাজন্যদের স্তাবকতা কতটা থাকত তা অবশ্য বলা যায় না। তবে রাজন্যরা নিজেরাই যখন নিজেদের বীরত্বের কাহিনী আবৃত্তি করতেন, তখন কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার তাঁদের প্রয়োজন হত না। কিন্তু ক্ষত্রিয় মাত্রই রাজা ছিলেন না, একথা মনে রাখা উচিত। সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা বীরগাথা গাইতেন মানে রাজন্যরাই যে গাইতেন, তা নাও হতে পারে।

সূত, স্তুতিগায়ক বা কবিমাত্রই রাজসভায় স্থান পেতেন না। রাজসভায় স্থান পাওয়াও সহজ ছিল না। তার জন্য অনেক ঠেলাঠেলি করার প্রয়োজন হত। যাঁরা স্থান পেতেন তাঁরা ভাগ্যবান, তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। যাঁরা স্থান পেতেন না, তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তাঁরা কি করতেন? বাইরের লোকসমাজে তাঁরা ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। গ্রামে-গ্রামে উৎসব পার্বণে, মেলায়-মেলায় তাঁরা কবিগান করে বেড়াতেন। কিসের গান? ঐ রাজসভার কবিদের রচিত গান। নিজেদের রচিত গান হলেও, তার মধ্যেও রাজস্তুতি ছাড়া অন্য কিছু থাকার উপায় ছিল না। ভাঁড়ের মতো একটু-আধটু সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার, তামাসা-রসিকতা করার হয়ত সুযোগ তাঁরা কিছু পেতেন এবং তার মধ্যে সমাজের যৎ-সামান্য বাস্তবরূপও প্রতিফলিত হত। রাজসভার কবিদের কাব্যেও যে হত না, তা নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রধানত কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হলেও তার মধ্যে তখনকার সমাজের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধ্যান-ধর্মাদির পরিচয়ও কম নেই। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র। বাইরের লোকসমাজে যাঁরা কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন, তাঁরাও রাজসভার পরিবেশ থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। রাজস্তুতি প্রাণের দায়ে তাঁদেরও করতে হত, যদিও রাজবৃত্তি হয়ত তাঁরা পেতেন না সকলে। কারণ যে-রাজার বা যে জমিদারের রাজ্যে তাঁরা বাস করতেন এবং যে-যুগে বাস করতেন তাতে স্বাধীন মনোভাবের বিকাশ হতে পারে না। বিকাশের সুদূর সম্ভাবনাও ছিল না তখন। স্বাধীন লেখক বা স্বাধীন কবি তখন কল্পনাতীত ব্যক্তি ছিলেন। কথায় কথায় রাজদ্রোহিতার অভিযোগে যখন রাজদণ্ড দেওয়া হত, তখন গ্রাম্য কবির স্বাতন্ত্র্য জাহির করার কোনো স্পর্ধা থাকা সম্ভবপর নয়। পেট্রনের যুগের এই হল প্রকৃত রূপ। সেইজন্যই সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং বলেছেন যে, 'The world is seen through the spectacles of the feudal lord; there is no feeling for the little man and no respect for physical labour.'

ফিউডাল লর্ডরাই সেদিন পর্যন্ত লেখক-কবি-শিল্পীদের প্রধান পেট্রন ছিলেন এবং তাই ফিউডালযুগের সাহিত্যে ও শিল্পকলায় তাঁদেরই রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ পড়েছে বেশি। বাংলা দেশে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণের সভাকবিদের যুগ সেদিন শেষ হয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা তার জের টেনে চলেছি। প্রকাশকরা আমাদের পেট্রনরূপে তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি। প্রকাশকযুগের আগের যুগ আসল পেট্রনদের যুগ, অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার যুগ, রাজসভার যুগ ও সভাকবিদের যুগ। বাংলা দেশের সেই পেট্রনযুগের কথা কিছু না বললে, প্রকাশক-যুগের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়।

সাহিত্যের ইতিহাসকে তাহলে আমরা তিনটি যুগে ভাগ করতে পারি— (ক) পেট্রনের যুগ, (খ) প্রকাশকের যুগ এবং (গ) পাঠকের যুগ। প্রাচীন ও মধ্যযুগ হল পেট্রনের যুগ। আধুনিকযুগ হল প্রকাশক ও পাঠকের যুগ। প্রকাশকের যুগ থেকে আধুনিকযুগে আমরা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হচ্ছি। সামন্ততন্ত্রের যুগ থেকে আধুনিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে উত্তরণকালে প্রকাশকব্যবসায়ীরা একটা যুগান্ত-কারী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে পেট্রনযুগের অচলায়তন থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর লোকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছেন প্রকাশকরা সর্বপ্রথম। সেকথা পরে বলব। তার আগে বাংলা সাহিত্যের পেট্রনযুগের সামান্য একটু পরিচয় দিই।

পালযুগ থেকে আরম্ভ করছি। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্য রচনা করেছিলেন। পালবংশের রাজা রামপালের কীর্তিকথাই রামচরিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কবি সাধারণভাবে গুণগান করেননি। রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিতকথা এবং গৌড়পতি রামপালের চরিতকথা যে একই এই কথাটুকু বলবার জন্য তিনি শ্লেষ অলঙ্কারের সাহায্যে একটি দ্ব্যর্থবাচক দুর্বোধ্য কাব্য রচনা করেছিলেন। কথাবস্তুর দিক দিয়ে রামচরিততুল্য কাব্য ভারতীয় সাহিত্যে আরও অনেক আছে—যেমন দণ্ডীর দশকুমারচরিত, বাণের হর্ষচরিত, পদ্মগুপ্তের নবসাহ-সাঙ্কচরিত, বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি। সবই পেট্রনযুগের অপূর্ব নিদর্শন এবং পেট্রনের মহিমাকীর্তন। কিন্তু বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বোধহয় সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। কেবল মহিমাকীর্তনে তিনি খুশি হন নি, রঘুপতি রামের সঙ্গে পালরাজা রামপালের তুলনা করতে গিয়ে তিনি এক কঠিন আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি শ্লোকের দুরকম অর্থ হয়—একটিতে রামায়ণ-কথা,

দ্বিতীয়টিতে রামপাল কথা বোঝা যায়। তা ছাড়া পেট্রনের প্রশস্তির তো তুলনাই হয় না।

সেনযুগের কথাও তাই। অনেকেই জানেন, লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব মিশ্র, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন। প্রধানত রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁরা তাঁদের কাব্যপ্রতিভা উৎসর্গ করেছিলেন বলা যায়। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কালিদাস। তিনি গীত-গোবিন্দের সুললিত পদ গাইতেন, আর পদ্মাবতী নাকি তালে-তালে নাচতেন। এই হল জনশ্রুতি। অর্বাচীন নয় জনশ্রুতি। তার কারণ, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি রামসরস্বতী তাঁর জয়দেব কাব্যে এই জনশ্রুতিকে স্বীকার করেছেন

জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে।
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে॥
কৃষ্ণর গীতক জয়দেব নিগদতি।
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী॥

জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাইছেন, পদ্মাবতী নাচছেন, আর পেট্রন লক্ষ্মণসেন শুনছেন ও দেখছেন। দৃশ্যটি কল্পনা করতেও তন্দ্রা আসে। মদিরার মতো গীতগোবিন্দের ভাব এবং মৃদঙ্গ ও নূপুরশিঞ্জনের মতো তার ভাষা ও ছন্দ। পেট্রনকে পটাবার অমোঘ অস্ত্র এর চেয়ে আর কি হতে পারে? তার উপর, রাজসভায় পেট্রনকে সম্ভাষণ করার ভাষা কি?

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সঙ্কল্প কল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালঙ্কার কারার্পিত
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্।

অর্থাৎ পরম পেট্রন রাজা লক্ষ্মণসেনকে সম্ভাষণ করে কবি বলছেন: 'হে লক্ষ্মীর কেলিনায়ক, হে জঙ্গমহরি, হে যাচকের কল্পদ্রুম, হে মুক্তিসাধকের সহায়ক, হে যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম, হে বঙ্গের প্রিয়, হে গৌড়েন্দ্র, হে রাজপ্রতিনিধি-সামন্তমণ্ডিত সভামণ্ডপের অলঙ্কার, হে বন্দীকৃত অরিরাজমণ্ডল, হে সজ্জনের পালক, তোমাকে যে দর্শন করলাম, তাতেই আমরা তুষ্ট।' ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, কবি জয়দেব এখানে যতগুলি 'বিশেষণ' প্রয়োগ করেছেন তার কটির যোগ্যতা লক্ষ্মণ-সেনের ছিল। 'লক্ষ্মীর কেলিনায়ক' তিনি ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু 'যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম,

ছিলেন কি? মুসলমানরা যখন রাজ্যের সীমান্তে হানা দিচ্ছে, বাংলার সৌভাগ্যরবি যখন ডুবুডুবু, তখন যিনি দৈবাচার্য ডেকে ভাগ্যগণনা করাচ্ছিলেন, তিনি যে কত বড় বীর ছিলেন, তা না বলাই ভাল। যাই হোক্ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে লাভ নেই। জয়দেবের মতো কবিও যে কিভাবে রাজ্যসভায় উপস্থিত হতেন, পূর্বোক্ত সম্ভাষণ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। পেট্রনযুগের এই হল বিশেষত্ব।

লক্ষ্মণসেন ধোয়ীকে 'কবি-ক্ষাপিত' বা কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ও প্রতীকরূপে দিয়েছিলেন স্বর্ণাভরণমণ্ডিত হস্তিব্যূহ ও হেমদণ্ডযুক্ত দুই চামর। উমাপতি ধর বলে গেছেন যে, চন্দ্রচূড়চরিত-কাব্য রচনার জন্য রাজা চাণক্যচন্দ্র অন্তরঙ্গ কবিকে নানারকম রত্নালঙ্কার বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং একশত গ্রাম দান করেছিলেন। বাংলার পাঠান-রাজারাও অনেকে এই প্রথা অনুসরণ করতেন।

'রাজসভায় সভাকবির সম্মান' পাওয়া পেট্রনযুগের কবির জীবনের চরম কাম্য ছিল। ধোয়ী সেকথা পরিষ্কার করে বলেছেন। শুধু ইহজীবনে নয়, তিনি বলেছেন—জন্মান্তরেও তাঁর সেই কামনা যেন চরিতার্থ হয়। আধুনিক প্রকাশক ও পাঠকের যুগে, বিশেষ করে পাঠকের যুগে, এই কামনার কথা বাইরে প্রকাশ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু তাই বা নয় কেন? রাজা ও রাজ্যের উপর সেটা নির্ভর করে এবং সেই রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে পাঠকগোষ্ঠীর—তথা জনসাধারণের ধারণার উপর। রাজা ও রাজ্যের প্রতি পাঠকগোষ্ঠী, অর্থাৎ জনসাধারণ যদি কোনো কারণে বিমুখ হন এবং কোনো কবি বা সাহিত্যিক যদি সেই রাজ্যের সভাকবি বা রাজকবির সম্মানলাভের বাসনা প্রকাশ করেন, তাহলে তিনি খেতাবই পাবেন, খ্যাতি নয়। কিন্তু রাজা ও রাজ্যের প্রতি কোনো কারণে জনসাধারণের যদি সহানুভূতি থাকে, তাহলে কবিসাহিত্যিকরা প্রাণপণে সেখানে রাজকবির সম্মান পাবার চেষ্টা করেন। আজও যে করেন, তার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'নোবেল প্রাইজ' থেকে 'স্ট্যালিন প্রাইজ' পর্যন্ত তার উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং ধোয়ীর কথার তাৎপর্য বদলেছে মাত্র, কথাটা বদলায়নি। অবশ্য তাৎপর্য বদলানোও কম কথা নয়। পেট্রন-রাজার যুগ আর পেট্রন-প্রকাশক ও পেট্রন-পাঠকের যুগের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। পেট্রন-রাজার যুগে সভাকবি হওয়া আর প্রকাশক-পাঠক-রাজার যুগে সভাকবির সম্মান পাওয়া এক-কথা নয়। পার্থক্য অনেক।

বাংলা দেশের প্রান্তীয় রাজসভাতেও পৌরাণিক ও রোমান্টিক কাব্যের চর্চা অব্যাহত গতিতে চলত। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর বীর ভাই শুক্লধ্বজ বা 'চিলা রায়' কবি-পণ্ডিতদের বিশেষভাবে সমাদর করতেন। সাহিত্যের পেট্রনযুগে কোচবিহারের রাজাদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুক্লধ্বজের আগ্রহে ও উৎসাহে কবি অনিরুদ্ধ মহাভারত-পাঁচালী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অনিরুদ্ধের উপাধি ছিল 'রামসরস্বতী'। তাঁর অগ্রজের নাম ছিল (বা উপাধি) 'কবিচন্দ্র'। অনিরুদ্ধ শুক্লধ্বজের সভায় পুরাণপাঠক ছিলেন, কবিচন্দ্র সম্ভবত নরনারায়ণের সভাকবি বা পাঠক ছিলেন। নরনারায়ণের বিদ্বৎপ্রীতি বর্ণনা করে রামসরস্বতী লিখেছেন।[২]

জয় নরনারায়ণ নৃপতিপ্রধান
যাহার সমান রাজা নাহিক যে আন।
ধর্মনীতি পুরাণ ভারত শাস্ত্র যত
অহোরাত্রি বিচারন্ত করিয়ে সতত।

নরনারায়ণের অনুজ শুক্লধ্বজ সম্বন্ধে রামসরস্বতী বলেছেন

শুক্লধ্বজ অনুজ যাহার যুবরাজ
পরমগহন অতি অদ্ভুত-কাজ।
তেঁহো মোক বুলিলন্ত মহাহর্ষ মনে
ভারত-পয়ার তুমি করিয়ো যতনে।
আমার ঘরত আছে ভারত প্রশস্ত
নিয়োক আপন গৃহে দিলোহোঁ সমস্ত।
এহা বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই
পঠাইল পুস্তক আমাসাক ঠাঁই।
খাইবার সকল দ্রব্য দিলন্ত অপার
দাস-দাসী দিলা নাম করাইলা আমার।
এতেক তাহান আজ্ঞা ধরিয়া শিরত
কৃষ্ণের যুগলপদ ধরি হৃদয়ত।
বিরচিলো পদ ইতো অতি অনুপাম—

শুক্লধ্বজ মহাহর্ষমনে রামসরস্বতীকে বলেছিলেন—'ভারত-পয়ার তুমি করিয়ো যতনে।' শুধু বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বইপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, খাদ্যদ্রব্য

২. শ্রীসুকুমার সেন: মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, পৃ ১৮-১৯

ও দাসদাসী দিয়েছিলেন কবিকে। তবেই কাব্যরচনা করা সম্ভব হয়েছিল। পেট্রনযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সভাকবি প্রথমে রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য করে, পরে কৃষ্ণের যুগলপদ হৃদয়ে ধারণ করেছেন। অর্থাৎ পেট্রন রাজার আদেশ আগে, তারপর দেবতা পতিভক্তি-ভালবাসা ইত্যাদি। আগে শুক্লধ্বজের আদেশ, তারপর কৃষ্ণের যুগলপদ। সর্বাগ্রে পেট্রন-বন্দনা, তারপর দেবতা-বন্দনা পেট্রনের চেয়ে বড় দেবতা পেট্রনযুগে আর কেউ ছিলেন না। তাই সবার আগে, সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ও ছন্দে সভাকবিরা পেট্রন বন্দনা করে গেছেন। রামসরস্বতীকে প্রথমে বলতে হয়েছে—'এতেক তাহান আজ্ঞা ধরিয়া শিরত'—তারপর 'কৃষ্ণের যুগলপদ ধরি হৃদয়ত।' শির বড়, না হৃদয় বড়, এখানে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। বাস্তব সমাজে বিগলিত হৃদয়ের তুলনায় উন্নত শিরের মর্যাদাই যখন বেশি, তখন শিরই বড়, হৃদয় তুচ্ছ।

কামরূপ রাজ্যে বা কাঙুর কামতায় রাজসভার পোষকতায় সাহিত্যের রীতিমত চর্চা হয়েছিল এক সময়। কামরূপ সাহিত্যের গোষ্ঠীপতি ছিলেন শঙ্করদেব (শঙ্করাচার্য নন)। শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য-উপশিষ্যরা এক বিচিত্র বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন। পেট্রন নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য শঙ্করদেব মল্লরাজের (মল্লভূমের রাজা নন) উদ্দেশে একাধিক 'ভটিমা' পদ রচনা করেছিলেন। যেমন ঃ

হাসি সুভাষিত করো বহু ধীর
মল্ল-নৃপতি সম নাহি-কয় বীর।
কাশী-বারাণসী গৌড় পর্যন্তে
মল্ল-নৃপতিক সব মহিমা কহন্তে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বারাণসীর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'প্রাণাভরণ' কাব্য লিখে মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রশস্তি গেয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা যখন পরম বৈষ্ণব হয়ে পড়েন এবং সাহিত্যচর্চার পোষকতা করতে থাকেন, তখন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে এমন কোনো কবি ছিলেন না যিনি মল্লরাজবংশের (বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের) প্রশস্তি গান নি। বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমানিক্যদেব নিজে সুকবি ছিলেন বলে শোনা যায়। ইনি 'সৎকাব্য-রত্নাকর' নামে কাব্যসঙ্কলন করেছিলেন।

৩ উদ্ধৃতিগুলি শ্রীসুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড, ১৮ পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত।

ভুলুয়ার রাজ্যসভায় ন্যায়শাস্ত্রেরও খুব চর্চা হত। লক্ষ্মণমানিক্যদেবের সভাকবি 'কবিতার্কিক' তাঁর 'কৌতুক-রত্নাকর' প্রহসনের প্রারম্ভে ভুলুয়া রাজধানীর ও রাজা লক্ষ্মণমানিক্যদেবের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনেকে বর্ধমানের রাজবংশের প্রশস্তি গেয়েছেন নানাভাবে।

রাজা-মহারাজা বা ভূস্বামীদের বেশ শ'খানেক পেট্রনরূপে না পেলে কবিদের যে কি দুর্গতি হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জীবনালেখ্য থেকে। বাংলা দেশে পাঠান রাজশক্তি তখন অস্তগামী। দেশের মধ্যে জায়গীরদার ও জমিদাররা প্রায় অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন। রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতার সীমা নেই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। ন্যায়বিচার নেই, নিরাপত্তা নেই, শান্তি-শৃঙ্খলা নেই। এই অবস্থায় মুকুন্দরামের পূর্বপুরুষরা যাঁর তালুকে ছয়-সাত পুরুষ ধরে বাস করেছিলেন, সেই দামিন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীও বকেয়া রাজস্বের দায়ে বন্দী হলেন

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
কোনো হেতু নাহি পরিত্রাণে।

মুকুন্দরামও খাজনার দায়ে পড়ে স্ত্রীপুত্র-ভাই সঙ্গে করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। ভেলিয়া গাঁয়ে পৌঁছে দুষ্টলোকের পাল্লায় পড়ে যখন তাঁর সর্বস্ব খোয়া গেল তখন যদু কুণ্ডু তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কবি লিখেছেন

ভাল্যায়েতে উপনীত রূপরায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥

মুড়াই নদী (মুণ্ডেশ্বরী) বেয়ে মুকুন্দরাম ভেঘট্যা (বা কেঁউটা) গ্রামে উপস্থিত হলেন। তারপর দারকেশ্বর উত্তীর্ণ হয়ে পাতুল গ্রামে পৌঁছুলেন। সেখানে কবির মাতুলপুত্র গঙ্গাদাস তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। তারপর তাঁরা দামোদর পার হয়ে গোচড্যা গ্রামে গেলেন। সেখানে কবির জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। কবির মায়ের রূপ ধরে দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কৃতার্থ করলেন। তারপর···

৪ এ-সম্বন্ধে অধিকাচরণ গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ 'কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য' দ্রষ্টব্য (প্রদীপ, অগ্রহায়ণ ১৩১২)

চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই পারাইয়া যাই
আরড়াতে হৈলাম উপসন্নে।

আরড়া ব্রাহ্মণভূমি।* স্থানীয় ভূস্বামীও ব্রাহ্মণ। নাম বাঁকুড়া রায়। তাঁর দ্বারস্থ হয়ে কবি যখন আত্মপরিচয় দিলেন তখন খুশি হয়ে রাজা বাঁকুড়া রায় অবিলম্বে দশ আড়া ধান মেপে দিয়ে তাঁকে ছেলেদের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবি লিখেছেন

সুধন্য বাঁকুড়া রায় আঙ্গিল সকল দায়
সুত-পাঠে কৈল নিয়োজিত
তাঁর সুত রঘুনাথ দ্বিজকুলে অবদাত
গুরু করি পূজিল বিহিত।

তারপর সুখে-দুঃখে কবির দিন কাটতে লাগল। বাঁকুড়া রায়ের পর রঘুনাথ রায় রাজা হলেন। কবিরও সুদিন দেখা দিল। কবি কিন্তু স্বপ্নের কথা ইতিমধ্যে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, যদিও ডামাল নন্দী তাঁকে প্রায়ই সেকথা মনে করিয়ে দিত।

সঙ্গে ছিল ডামাল নন্দী সে জানে স্বপন-সন্ধি
অনুদিন করয়ে যতন।

অবশেষে পুত্রের মৃত্যু কবিকে সচেতন করল। দুঃখ করে একদিন তিনি রাজাকে বললেন

কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ
গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা
শুন রঘু নরপতি দুঃখে কর অবগতি
অকালে বিকাইল মোর হাল্যা।

শুনে রঘুনাথ অবিলম্বে 'চন্ডীমঙ্গল' রচনা করতে অনুরোধ করলেন। তারপর সম্পূর্ণ কাব্য রচিত হয়ে যখন গীত হল, তখন প্রচলিত প্রথানুসারে রাজা কবিকে ও গায়েনকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন।

কানে সোনা করে বালা গলে দিল কণ্ঠমালা
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ।

পেট্রনযুগের আসল রূপটি কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের জীবনে যেমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, এরকম আর কারও জীবনে বোধহয় হয় নি। তাঁর জীবনের প্রতি পর্বে

* 'ব্রাহ্মণভূমি' উত্তর-মেদিনীপুরে।

এই কথাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পেট্রনপ্রধান যুগে কাব্যচর্চা বা সাহিত্য-চর্চা পেট্রনের পক্ষপুটে না থেকে করা সম্ভব নয়। 'প্রভু গোপীনাথ নন্দী'র তালুক দামিন্যায় (বর্ধমানে) যখন মুকুন্দরাম বাস করতেন তখন তাঁর কাব্যশক্তির বিকাশ তেমন হয়নি। প্রভুর তালুক যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন প্রভুহীন মুকুন্দরাম নোঙরহীন নৌকার মতো জীবন-সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে চললেন। কোথায় কিনারা, তার কোনো ইসারাও পেলেন না কোথাও। রূপরায়ের বিত্তহরণের পর যদু কুণ্ডুর কাছে আশ্রয় পেলেন বটে, কিন্তু মাত্র তিনদিনের জন্য। পাতুল গ্রামে মাতুলপুত্রের সাহায্যও বিশেষ কাজে লাগে নি। গোচড্যা গ্রামে দেবীকে স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। পেট্রন-যুগের মাহাত্ম্যের দিক থেকে কবিকঙ্কনের জীবনের এইটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পেট্রনের মাহাত্ম্যের কাছে স্বয়ং দেবদেবীর মাহাত্ম্যও যে কিছু নয়, মুকুন্দরামের জীবনের এই ঘটনা তার ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। স্বপ্নে দেবীদর্শনের পরেও কবি-কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব হল না, কারণ তখনও হতভাগ্য কবির জীবনে পেট্রনদর্শন ঘটেনি। দেবী স্বপ্নে তাঁকে পেট্রনের সন্ধান দিয়ে দিলেন তবেই তিনি আরড়াতে গিয়ে বাঁকুড়া রায়ের দেখা পেলেন। কবির জীবনে দেবী চণ্ডীর চেয়ে ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের প্রাধান্য অনেক বেশি, কারণ তিনি পেট্রনের কবি। তাও আবার বাঁকুড়া রায় তাঁকে দশ আড়ি ধান মেপে দিয়ে পুত্রের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবি হবার সুযোগ তখনও পেলেন না মুকুন্দরাম, প্রাইভেট টিউটর হয়ে রইলেন। মাস্টারি করতে-করতে দেবীর স্বপ্নের কথা তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। তারপর রঘুনাথ রায় যখন রাজা হলেন এবং রাজা হয়ে তাঁকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনার আদেশ দিলেন, তখন তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হল, প্রায় শেষ জীবনে। অর্থাৎ পেট্রনের যখন সত্যিই আবির্ভাব হল জীবনে, তখন তিনি 'প্রাইভেট টিউটর' থেকে 'পোয়েট' হবার সুযোগ পেলেন এবং কাব্য রচনা করে রাজার কাছ থেকে 'কানে সোনা, করে বালা', 'গলে কণ্ঠমালা', 'করাঙ্গুলি রতনভূষণ' ইত্যাদি উপহার পেলেন।

পেট্রনযুগের এই নিয়ম। পেট্রন দেবতা, পেট্রনই হর্তাকর্তাবিধাতা। পেট্রনই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উৎসাহদাতা, অন্যতম শ্রোতা ও পাঠক। বাইরের সবকিছুর সম্রাট যিনি, সবকিছুর পেট্রন যিনি, তিনি সাহিত্যেরও সম্রাট, সাহিত্যেরও পেট্রন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে কবি পণ্ডিতদের একপাও চলবার উপায় নেই, একটি কবিতা বা একটি শ্লোক পর্যন্ত রচনা করার শক্তি নেই। যদু কুণ্ডু আর

গঙ্গাদাসদের সাধ্য কি কবিকে প্রেরণা দেন? রূপরায়ের মতো দুষ্ট লোক মুকুন্দরামের বিত্তহরণ করেছিলেন বলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ তার কাছে মুকুন্দরাম আর যে-কোনো রাম একই কথা। আধুনিকযুগেও কি তাই নয়? পকেটমার ও চোর-ডাকাতরা এ-যুগের কবি-সাহিত্যিকদের যে খাতির করে চলে, তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এ-বৈশিষ্ট্য শুধু পেট্রনযুগের নয়, প্রকাশক ও পাঠকের যুগেরও।

অনুবাদ

ধনপতি দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ

মহাশ্বেতা দেবী

["কবিকঙ্কণ চণ্ডী"র সুকুমার সেন সম্পাদিত সংস্করণের সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদ থেকে 'বণিকখণ্ডে'র একটি ক্ষুদ্র অংশ এটি। আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ মূল পুস্তকানুগ। সংকলিত অংশের পূর্ব কাহিনীক্রম এই রকম: উজানিনগরের রাজার আদেশে ধনপতি সাধু গৌড়ে এক বছর থাকেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী লহনা, ঈর্ষাজর্জর হয়ে, দ্বিতীয় স্ত্রী সুন্দরী খুল্লনাকে এক বছর বনে ছাগল চরাবার কাজে রাখেন। ধনপতি ফিরে এলে খুল্লনার দুঃখ দূর হয়। তখন ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সকল বেনেদের ডাকেন। এই উপলক্ষে বেনেরাও শোধ নিলেন। ধনপতির প্রতি রাজার পক্ষপাতিত্ব, ধনপতির ঐশ্বর্য, এসবের কারণে তাঁরা ঈর্ষিত ছিলেন। সংকলিত অংশে, পরস্পর-সম্পর্কহীন দুটি তথ্য লক্ষ করার মত। এক, যে কাজ সমাজের চোখে অন্যায় সে কাজ করে ধনী ও রাজানুগৃহীত ধনপতিও পার পাননি। দুই, চাঁদ বেনে, কবিকঙ্কণের সময়ে ছিলেন বাস্তব ব্যক্তি। "অভয়ামঙ্গল" কাব্যের প্রায় সমকালে "মনসামঙ্গল" রচিত। শেষোক্ত কাব্যে চাঁদ বেনে অলৌকিকত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎসর্গিত ব্যক্তি। এই লেখায় চাঁদ বেনে সামাজিক মানুষ এবং ছয় মৃত পুত্রের পিতা। সম্ভবত বণিকরা, পুত্রদের মৃত্যুর জন্য চাঁদকে পাপী ঠাউরেছিলেন। সেইজন্যে, চাঁদ তাঁদের সমাজপতি হলেও, তাঁকে প্রথম সম্মান না জানানো বেনেদের মনঃপূত হয়নি। সামাজিক বাস্তবতাবোধ, মানব-চরিত্র অনুধাবনা, ইত্যাদিতে মুকুন্দরাম আজও কত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়, তা হয়ত বোঝা যাবে। মুকুন্দরামের ভাষা আমি যথাযথ, নির্মিতি না বদলেই বাঁচিয়ে গেছি। আমার বিশ্বাস, মুকুন্দরাম স্বাধিকারে বাংলা গদ্যের জনক

হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। ছন্দোবদ্ধ তাঁর লেখা, নির্মিতিতে, ঋজুতায়, বৈয়াকরণিক বিচারে গদ্যেরই আত্মীয়। সম্ভবত এইজন্যেই, তিনি শ্রদ্ধা যত পেয়েছিলেন, পাঠক বা শ্রোতাপ্রিয়তা তত পান নি]।

১

ব্রাহ্মণের মুখে পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধমতে করার নির্দেশ শুনে ধনপতি দত্ত যথাবিধি সকল সরঞ্জামের আয়োজন করলেন। দেশে-দেশে যত জ্ঞাতকুটুম্ব আছেন, সকলকে চিঠি লিখলেন ধনপতি। উজানিনগরের ব্যবহার-রীতি মতে সন্দেশ ও সুপুরি পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করা হল। এ সব কাজের কাণ্ডারী খুল্লন ঘরে-ঘরে বলে এল।

সবাই যাঁর কুলের গরিমা গান করে, বর্ধমান থেকে এলেন সেই ধুম দত্ত বেনে। লক্ষ্মী ও গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে হাতি চেপে চম্পা নগরীর চাঁদ সওদাগর এলেন। কর্জনা থেকে এলেন হরি লাহা, এবং নীলাম্বর দাসরা নয় ভাই এলেন নয় ঘোড়া চেপে বহু লস্কর-নিয়ে।

গণপুরের বেনে-সমাজ থেকে এলেন সনাতন চন্দ, তাঁর দুই সহোদর গোপাল ও গোবিন্দ। হুগলীর দশঘরায় যাঁর বাড়ি সেই বাসু লাহা এলেন। হুগলী-সিয়াখালার বেনে শ্রীধর হাজরা এলেন। সাঁক থেকে শঙ্খ দত্ত নামে বেনে এলেন। আটটি ঘোড়া রাতেদিনে এর রথ টানে। গায়ে পামরি বা সূচীকাজে অলংকৃত চাদর জড়িয়ে বিষ্ণু কুণ্ডুরা সাত ভাই সাতটি দোলা চেপে এলেন। ঝাড়গ্রামে যার বাস সেই রঘু দত্ত এলেন, এলেন কায়থি গ্রাম থেকে অরবিন্দ দাস। ফতেপুর-বড়শূল খুব নামী গ্রাম। সেখান থেকে এলেন সুবুদ্ধির জন্যে খ্যাত হরি চন্দ বেনে।

বার্তন বা আমন্ত্রণ বার্তা পেয়ে তেনরির বেনে গোপাল দত্ত রাত-দিন পথ চলে এসে গেলেন। শীতলপুর থেকে রাম রামুরা দশ ভাই এলেন কেউ বা ডাঙ্গা পথে, কেউ বা নৌকোয়। যাঁর বাড়ি নাড়ু গাঁ, সেই রাম দত্ত এলেন, পাঁচড়ার বেনে চণ্ডীদাস খাঁ এলেন। সপ্তগ্রাম থেকে এলেন রাম দাঁ বেনে, বিষ্ণুপুরের বেনে এলেন যশমন্ত খাঁ। যাঁর কুল-শীল-ব্যবহার নির্দোষ, নিবাস খাড়ঘোষ, সেই বাসু লাহা এলেন। হালিসহর থেকে পাঁচজন বেনে এলেন, রাম-রঘু-রাঘব-কেশব জনার্দন। গোতান থেকে ছয় ভাই এলেন, ধুম দত্ত-যাদব-মাধব-হরি-শ্রীধর-বলাই। ধনপতির শ্বশুর লক্ষপতি সাধু নানা ধনদৌলত নিয়ে জামাইবাড়ি এলেন।

একজন-একজন করে কত বেনের বা নাম করব! ধনপতির বাড়ি সাত শো বেনে এলেন। সম্পর্ক বিচারে কেউ পায়ের ধুলো নেন, কেউ আলিঙ্গন করেন নমস্কারে-আশীর্বাদে মহা গণ্ডগোল বাধল। সকলকেই ধনপতি লাল কম্বলের আসনে বসালেন, সানন্দে পান-কর্পূর এনে দিলেন।

অভয়ার চরণে আমার চিত্ত নিমগ্ন হোক। শ্রীকবিকঙ্কন এই মধুর সঙ্গীত গাইছেন।

২

বেনের ছেলে ধনপতি তার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করছেন। পুরোহিত সযত্নে সব যোগান দিচ্ছেন, যথা, তিল-তুলসী-গঙ্গাজল-কুশ-ব্রাহ্মণবালক কলাগাছের খোল-যব-দূর্বা-ফুল ও চন্দন।

শ্রাদ্ধারম্ভের অনুমতি জানালেন পুরোহিত, বেদমন্ত্র বলে ধনপতিকে শ্রাদ্ধস্থলে স্বাগত জানালেন, কুশাসন দেখলেন। ব্রাহ্মণরা ধনপতির মাথায় হাত দিয়ে যজুর্বেদ গাইলেন ও যজ্ঞেশ্বর দেবতাকে আবাহন করলেন।

পণ্ডিতেরা কপালে ফোঁটা পরে পশমের সূচীকাজ করা কম্বলাসন বা সকল্লাথ পামরী কম্বলে ঘটা দিয়ে বসেছেন। রেশমের কারুকাজ-করা থোপনায় বাঁধা চাদোয়া ওপরে টাঙানো। ধূপে শ্রাদ্ধস্থল আমোদিত।

ধনপতি দান করছেন স্বর্ণ-বস্ত্র ব্রাহ্মণদের, পাদ্য-অর্ঘ্য-ধূপ-দীপ-কোশাকুশিতে সুগন্ধি গঙ্গাজল সহ। ভুজ্যি দিচ্ছেন একশোটি, তাতে কাপড়-সোনা জুতো থাকছে। কুশ হাতে ব্রাহ্মণ বালক বা বটুকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সোনা-রূপো-কাপড়-গরু দিয়ে সাধু যার যা ইচ্ছা, তা পূর্ণ করছেন। তাঁর ঘরে যে সব শত-শত ব্রাহ্মণ আসছেন, তাঁদের পূজা করে সন্তুষ্ট করছেন ধনপতি। ব্রাহ্মণদের হাতে ধনপতি এমন সযত্নে অর্ঘ্য ও গন্ধদ্রব্য দিচ্ছেন, যেন কন্যাকে সভয়ে, সসম্ভ্রমে বরের হাতে সম্প্রদান করছেন।

যথাবিধি পিণ্ডদানের পর শ্রাদ্ধ শেষ হল। ব্রাহ্মণদের বহু সম্মাননা করলেন ধনপতি। এবার বেনে-সমাজের বান্ধবদের সম্মান জানাতে সোনার থালায় চন্দন-ফুলের মালা নিয়ে চললেন ধনপতি। মনে ভাবলেন, কাকে আগে সম্মান জানাব?

৩

শ্রীকবিকঙ্কন এই রসময় গীত গাইছেন।

মনে-মনে ধনপতি সওদাগর বলছেন, 'কাকে যে আগে পূজা বা চরণবন্দনা করি? মহাতেজা চাঁদ বটে সবার ওপরে। দুর্বাসা ঋষির গোত্র, কুলপতিও বটেন, এর আগে অন্য কে পূজা পাবে?' মনে-মনে এমন বিচার করে ধনপতি সর্বাগ্রে চাঁদ বেণের পায়ে জল দিয়ে কপালে চন্দন ও গলায় মালা দিলেন।

এমন সময়ে শঙ্খ দত্ত কিছু কথা বললেন। তিনি বললেন, 'বেনে-সমাজের সভায় আমিই আগে মান পাই। ধনী হয়েছ বলে তোমার সে কথা স্মরণে নেই। ধূম দত্ত যখন বাপের শ্রাদ্ধ করল, তার বাড়ির শ্রাদ্ধসভায় ষোল শো বেনে। ষোল শো বেনের আগে শঙ্খ দত্ত মান পায়। সে কথা এখানে ধূম দত্ত জানে, ওই সুবুদ্ধি হরি চন্দ্রও জানে।'

এ কথা শুনে ধনপতি উত্তর দিলেন, 'সে সময়ে চাঁদ সওদাগর সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। যাঁর বাড়ির বাহিরমহলে সাত মরাই টাকা, সেই চাঁদ ধনে-মানে-কুলে-শীলে রাঁকা, বা রিক্ত নন।'

এ কথা শুনে কথা বললেন নীলাম্বর দাস। তিনি বললেন, 'কুলের পরিচয়ে কলঙ্ক থাকলে ধনদৌলত তা ঘুচায়। যার ঘরে ছয়টা পুত্রবধূ বিধবা, টাকা আছে বলে সেই চাঁদ সবার মধ্যে সাঁড় বা সেরা হল?'

চাঁদ বললেন, 'নীলাম্বর দাস! তোকে জানি, তোর বাপের কিছু ইতিহাসও জানা আছে। হাটে-হাটে তোর বাপ আমলকী বেচত। মেয়েছেলেরা তা কিনত। বেশ্যাদের সঙ্গে সে রোজ হাতাহাতি করত। স্নান না করেই বেটা খেতে বসে যেত।'

নীলাম্বর দাস বললেন, 'শোন রাম রায়! বাবা পসার করতেন, তাতে অসত্য কিছু নেই। কড়ির পুটলি বাঁধা বেনে জাতের প্রচলিত ব্যবহার। কিন্তু এঁটো খোসা খেলে কি কুলের কলঙ্ক হয় না? এখন তুমি নিজের মনে বাঁচাবার কথা মনেও করছ না? সভার মধ্যে কথা বলছ, ঘন-ঘন মাথা নাড়ছ?

রাম রায় নীলাম্বর দাসের শ্বশুর। জামাইয়ের মান বাঁচাতে তিনি ধনপতিকে ভর্ৎসনা করে অনেক কথাই বললেন। যথা, 'রঙ্ক বা নিঃস্ব হলেও জাতে দোষ ঢোকে না। বউ বনে ছাগল চরালে তাতে কিন্তু কলঙ্ক হয়।'

সভার সকলের কেউ এ প্রসঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, কেউ সায় দিলেন। দ্বিজ "হরিবংশ" পাঠ করছেন, রাম রায় তাই শুনতে থাকলেন।

দামুন্যা নগরে দেবতা রামচন্দ্রাদিত্য হলেন দামুন্যার তালুকদার নন্দীদের গৃহ-

দেবতা। এই বিগ্রহের পূজারী কবির পিতা-পিতামহ, এবং কবি শিশুকাল থেকে তাঁর নিত্যসেবা করেছেন। শ্রীকবিকঙ্কণ সেই দেবতার চরণ অনুক্ষণ মনে রেখে চণ্ডিকামঙ্গল রচনা করছেন।

৪

বেনেরা এক জায়গায় বসে আছেন। ব্রাহ্মণ "হরিবংশ" পড়ছেন, রাম রায় শুনছেন। ধনপতি মাথা নিচু করে বসে আছেন। কেউ বা তাঁকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করছেন এবং তাঁর বিপক্ষীয় বণিকরা হাসছেন।

ব্রাহ্মণ পাঠ করছেন, 'কংস বললেন, শোন ভাই! নিজের কলঙ্ক-কথা বলি, আমি উগ্রসেনের ঔরস-জাত পুত্র নই, দ্রুমিল্য দৈত্যের বংশ, ভুবনে বিখ্যাত কংস, তার পিতা উগ্রসেনের ভয়ের কারণ কি?

'জন্ম দেন জননী, যাঁর ঔরস, তিনিই পিতা। তবু দেখা গেল ছেলের চেহারা অন্যরকম। লোকে অপযশ করল। কংস রাজা জারজ, এই কথাই যমের সভায় চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা থাকল।

'জীর্ণ বস্ত্রের মতই কি নশ্বর রমণীর জাতধর্ম, দুটিই অনেক যত্নে রক্ষা করতে হয়। মনে বিচার করে দেখ এ কথা ভাল কি না। যেখানে-সেখানে যাওয়া দুয়েরই অনুচিত। মেয়েদের শৈশবে রক্ষক পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র। উগ্রসেন অভাজন, বেদে মন ছিল না তাঁর, স্ত্রীকে অন্তঃপুরে আটকে রাখেন নি।

'আমার মা কেশিনী, উগ্রসেনের স্ত্রী, রূপে দেবতাদের মনেও মায়া জাগান। দৈবগতিকে তাঁর কি হোল শোন। ঋতুবতী হয়ে পুত্রজন্ম সূচনার আগেই তিনি জলখেলা করতে চাইলেন।

'এক শো দাসী সঙ্গে নিয়ে জলবিহারে বেরিয়ে রাণী পাহাড়পর্বতের শোভা দেখছেন। দ্রুমিল্য তাঁকে দেখে কামশরে অবশ হলেন। কেশিনী বড়ই মনোলোভা।

'দানবপতি দ্রুমিল্য স্বকার্য হাসিল করতে উগ্রসেনের মূর্তি ধরলেন। বনে লুকিয়ে কেশিনীর আলিঙ্গন প্রার্থনা করলেন ও বনে দুজনের দেহমিলন ঘটল। সতীর ক্রোধের ভয়ে মিলনের পর দ্রুমিল্য একটু সময়ও থাকলেন না, কোন হাসি-ঠাট্টাও করলেন না। মনে সন্দেহ জাগল কেশিনীর, ঘরে এসে স্বামীকে দেখে মনে ব্যথা পেলেন।

'নারদ মুনি এসে আমাকে আবার জন্মের এই রহস্য জানিয়ে গেছেন। সেই

সময় থেকে মনে অন্য চিন্তা নেই, উগ্রসেনের ওপর ভক্তির লেশও নেই। যার স্ত্রী বনে-বনে ফেরে, তার সংসার করা বৃথা, সে কেন তবে বিয়ের সাধ করে? যাকে কাছে না পেয়ে স্ত্রী বনে-বনে ফেরে, তার কুলে নিশ্চয় কলঙ্ক লাগে।'

পাঠ শেষ করে পাঠক পুঁথি বাধলেন, ধনপতি পাঠক-ব্রাহ্মণকে সোনা দিলেন। শ্রীকবিকঙ্কণ বলছেন, সমবেত বেনেরা খলখল করে হাসল, ধনপতি মাথা নুইয়ে বসে রইলেন।

৫

রাম দত্ত বিবাদ বাধাতে একমনা হয়ে, ধনপতিকে বিড়ম্বনা দিতে এখন রামায়ণ-পাঠ শুনতে চাইলেন। যে সব বণিকরা রাম দত্তের অনুগত, তারা একমনে রামায়ণ শুনতে থাকল।

পাঠক পড়ছেন, 'সীতা উদ্ধারের জন্য সেতু বেঁধে সমুদ্র পেরোচ্ছেন শ্রীরঘুনন্দন। লঙ্কার উপবন ঘিরছেন অঙ্গদ-সুগ্রীব-নল-নীল-মহাবল হনূমান। পরাজিত বিভীষণ রামের শরণ নিচ্ছেন। রাবণের গড় ঘিরে বানররা পাহারা দিচ্ছেন। রামের সেনা যত বানর, তাঁরা রাবণের উদ্যানে অবস্থিত প্রমোদশালা ও গাছপালা ভাঙতে থাকলেন। একথা শুনে রাবণ রাক্ষসদের যুদ্ধে নিয়োগ করলেন। যথা ত্রিশিরা-নিশুম্ভ-ইন্দ্রজিত। যুদ্ধে পাঠালেন দেবান্তক মহোদর নরান্তক ও অতিকায় ইত্যাদি এক শো ছেলেকে। সুগ্রীব-অঙ্গদ-নীল-পনস-কুমুদ ও হনূমান অত্যন্ত রণকুশলী। বানররা চড়-চাপড় মেরে যুদ্ধ করছেন; জাতু, বা জাতুধান, বা রাক্ষস সেনারা মারা যাচ্ছেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিত মারা গেছেন। রাবণ পরাজয়ের দুর্ভাবনায় চিন্তিত। কুম্ভকর্ণকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যুদ্ধে পাঠালেন রাবণ, রামের বাণে তিনিও মরলেন। স্বয়ং দশানন ভীষণ যুদ্ধ শুরু করলেন।

'রাক্ষসদের সকলকে মৃত দেখে দশানন দুঃখ পেয়েছেন, রথে চড়ে রামের সাথে লড়ছেন। রাবণের ওপর বিধাতা বিরূপ। প্রথম যুদ্ধেই রাম চক্রবাণে কেটে ফেলেছেন রাবণের মুকুট। রামের সম্মান রাখতে ইন্দ্র পাঠাচ্ছেন রথ। সে রথের সারথি মাতলি; দেবতারা সাগ্রহে দেখছেন। রাম রথ চড়ে রাবনের সঙ্গে লড়ছেন। বাণে মহামন্ত্র পড়ে ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়ে রাম রাবণের বুকে মারছেন ঝড়ে যেমন কলাগাছ পড়ে, তেমনি করে রথ থেকে বীর রাবণ পড়ছেন, দশ মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। রাবণ যুদ্ধে নিহত, ইন্দ্রের মনে সন্তোষ, বিভীষণ বসছেন

সিংহাসনে। শুভক্ষণ বেলা দেখে পাটের দোলা চেপে সীতা আসছেন রাম সম্ভাষণে। সীতার মুখ দেখে রাম মনে বড় দুঃখ পেয়েছেন, তাই মাথা নিচু করে কথা বলছেন।

ত্রিপদী ছন্দে বেঁধে পাঁচালী রচনা করছেন শ্রীকবিকঙ্কণ।

৬

রামায়ণ পাঠ চলছে। রাম বলছেন, 'যার স্ত্রী এক রাতও পরের ঘরে থাকে চিরকাল তাকে মন্দ বলে সকলে। সীতা কতকাল রাবণের ঘরে ছিলে! এখন তোমাকে গ্রহন করে রঘুকুলে কলঙ্ক আরোপ করব কি করে? জানকী, তোমার প্রকৃত অবস্থা আমি জানি। তাই সত্যি। তুমি ছিলে নিরুপায়, এবং বাঘের মুখে হরিণী যেন ভক্ষিত হল। সীতা! সেতুবন্ধ করে রাবণকে মেরেছি, তোমাকে উদ্ধার করেছি। এখন যথা মন তথা যাও।

'রামের মুখ থেকে একথা বেরুতে জানকীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সীতা মাটিতে পড়ে মূর্ছা গেলেন। লক্ষ্মণ তাঁর মাথায় জল ঢাললেন। লক্ষ্মণের অনেক যত্নে সীতা জ্ঞান ফিরে পেলেন। তখন কৃপাময় রাম বলছেন, আমার কাছে থাকতে যদি ইচ্ছে থাকে, যদি প্রকৃত সতী হও, তবে অগ্নিপরীক্ষা নাও।

'রামের এহেন কথা শুনে সীতা পরীক্ষা নিতে অনুমতি দিচ্ছেন। ব্রহ্মা হংসারূঢ় হয়ে সেখানে থাকলেন। সর্বজন সমক্ষে সীতা পরীক্ষা নিলেন। পরীক্ষায় তিনি "সতী" প্রমাণিত হলেন। সকল দেবতা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। আনন্দে তাণ্ডব নাচ জুড়লেন বিভীষণ ও বানর সেনা। পরীক্ষায় শুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে তবে জনকনন্দিনী রামের সঙ্গে একঘরে রাত কাটালেন।'

পড়া শেষ হলে পাঠক-ব্রাহ্মণ পুথি বাঁধলেন। রামায়ণ শুনে মাথা নিচু করে রইলেন ধনপতি।

অলঙ্কার কুণ্ডু বড়ই মুখর ও প্রখর লোক। ঘন-ঘন মাথা নেড়ে সে সভার মধ্যে বলতে আরম্ভ করল, 'রঘুনাথ চতুর্দশ লোকের স্বামী। ব্রহ্মা আদি দেবতারা তাঁকে প্রণাম জানান। স্বামীর জন্য অপেক্ষা না-করে তাঁর স্ত্রী বন্দিনী হন। রাম হেন মানুষও লোককথার ভয়ে তাঁকে সতীত্বের পরীক্ষা স্বরূপ অগ্নিপরীক্ষা করিয়ে ঘরে আনেন।'

'সাধু ধনপতি কি রাম-রাজার চেয়েও বড়? যার যুবতী স্ত্রী বনে ছাগল নিয়ে ঘুরত? যে বনে নেকড়ে ও ভালুকের সঙ্গে শতেক মাতালও ফেরে, সেই বনে তার

বউ ছাগল-রাখাল ছিল। দোষ-গুণ বিচার না-করেই ধনপতি সাধু খুল্লনার হাতে ভাত খেল। উচিত কথা বলতে আমার ভয়টা কি? স্ত্রীর সতীত্বের পরীক্ষা না নেয় যদি, ধনপতি একলক্ষ টাকা দেবে।'

যখন অলঙ্কার একথা বলল, বণিক-সমাজ তাকে তারিফ করল। সবাই বলল 'যদি সতী বলে পরীক্ষা নেয় খুল্লনা, তবে সকলকে নিমন্ত্রণ খেতে অনুমতি দেব।'

জল আনবার ছল করে ধনপতি অন্দরে উঠে গেলেন। লহনাকে ভর্ৎসনা করে কিছু বললেন।

এদিকে বণিক-সভায় গণ্ডগোল। শঙ্কর দত্ত বললেন, 'চল, ঘরে ফিরি'।

খুল্লনার বাপ লক্ষপতি দত্ত, উজানিনগরের রাজা অসন্তুষ্ট হবেন, এই দোহাই দেখিয়ে সকলকে নিবৃত্ত করলেন ও বললেন, 'নারী একা ভ্রমণ করলে কোনো দোষ হয়না। সতীত্ব-নাশের সম্ভাবনায় সতী রমণী গাঁটে-বাঁধা মাছর বিষ খেয়ে মরতে পারেন।'

অভয়ার চরণে আমার চিত্ত মগ্ন হোক। শ্রীকবিকঙ্কণ এই মধুর সংগীত গাইছেন।

৭

লক্ষপতির কথায় খেপে গিয়ে শঙ্খ দত্ত বেনে বললেন, 'জামাইয়ের রাজবল আছে বলে তুমি মত্ত হয়েছ? জ্ঞাতিকে রাজা দেখাচ্ছ? এর উচিত ফল পাবে। জ্ঞাতগুষ্টি চটে গেলে গরুড়ের ছেলের অবধি পাখা খসেছিল। গরুড় পাখিদের রাজা। তাঁর ছেলে সম্পাতি অহংকারের বশে জ্ঞাতিদের উপেক্ষা করেন। ফলে আকাশে ওড়ার কালে সূর্যের তাপমণ্ডলে পড়লেন, তাঁর ডানা সূর্যতেজে পুড়ে গেল।

'রাজা ধন নেন, জল্লাদ প্রাণ নেয়, বন্ধুজনই জাতি দেয় ও নেয়। রাজগর্বে গর্বিত হয়ে, কারো কথা না শুনে, যুদ্ধে নিহত হন দুর্যোধন। যাঁকে দশজন নিন্দে করে, তিনি যদি রাজাও হন, তবু তাঁর যশ নষ্ট হয়। জান না? রাম এক ধোপার কথা শুনে সীতার সতীত্ব পরীক্ষা নিয়ে সীতাকে আবার বনবাসে দেন?

'একা ধনপতিই কি রাজার পাত্র? পৃথিবীতে অন্য যেসব বেনেরা আছে, তারাও অন্য রাজাদের নিকট-জন। আমরা শত জন মিলে রাজা বিক্রমকেশরীর কাছে যাব। রাজাই উচিত বিচার করে দিন?'

বণিক সমাজ বসে থাকলেন। লক্ষপতি যত মিষ্টি কথাই বলুন না কেন, শঙ্খ দত্ত সে কথায় মন দিলেন না।

শ্রীকবিকঙ্কণ বলছেন, ধনপতি সাধু সাভিমানে লহনাকে কত কথা বললেন!

কবিতাগুচ্ছ

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা : একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সুধীন্দ্রনাথ যাঁর কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন "আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে প্রকৃত গীতিকবিতা লেখেন কেবল আপনি", বুদ্ধদেব বসু যাঁকে বলেছিলেন "বাঙলা লিরিকের অগ্রণী কারুশিল্পী," সেই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার প্রধান চরিত্রলক্ষণ গীতিধর্মিতা বা লিরিসিজম। আমি মনে রাখছি যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যর কবিতা পর্ব থেকে পর্বান্তরে ছড়িয়ে আছে; কোনো কোনো পর্বের কবিতায় এই গীতিধর্মিতা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও গৌণ, এবং তাঁর একেবারে প্রথম দিকের কবিতার প্রিরাফেলাইট, চিত্রল গীতিময়তা ("আমার প্রাথমিক কবিতায়...প্রিরাফেলাইট সিম্বলের অঙ্কুর থাকে"—সঞ্জয় ভট্টাচার্য), তাঁর মধ্যপর্বের কবিতায় একেবারেই অনুপস্থিত; আমি আরো মনে রাখছি যে এই কবি একসময়ে ট্রট্স্কিপন্থী ছিলেন, যিনি লিখেছিলেন "আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের পরাভবে দেশে দেশে সাম্যবাদের ধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠেছে, যার স্বরতরঙ্গের ছোঁয়াও আমরা পাচ্ছি",রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে যাঁর তৎকালীন মন্তব্য হচ্ছে "কুয়াশাচ্ছন্ন, সামাজিক মনের রূপ। তাতে আছে সত্যতাবিরোধী অতীতাশ্রয়ী শান্তির ঈপ্সা···ভাববিলাস, আছে সহৃদয় ধনিক-বৃত্তিসুলভ দরিদ্রের প্রতি কৃপণ করুণা'; আরো স্মর্তব্য যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, এবং পুরাণে সমধিক আগ্রহী ছিলেন, এবং তাঁর এই আগ্রহ প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কোনো-কোনো পর্বের কবিতায়; কিন্তু সমস্ত সত্ত্বেও, অন্তঃশীল ফল্গুর মতো একধরণের চিত্রময় গীতলতা তাঁর কবিতার অভ্যন্তরে সর্বদাই কাজ করেছে বলে আমার ধারণা, কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো বা ঈষৎ পরোক্ষভাবে, গোপনে। এবং শ্রী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাগর'-এর কুড়িটি কবিতা বিষয়ে

যে সার্থক মন্তব্য করেছেন "কোথাও কঠিন ভূগোলমৃত্তিকা নেই, কিংবা শরীরী মানুষ—জাপানি ওয়াশ দিয়ে আঁকা ব্যক্তিবৃক্ষবিরলছায়াচ্ছন্নতা", তা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনেক কবিতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রথম দিকের কবিতায় তিনি যে নির্ভার, রূপকল্পময় গীতিকবিতা দিয়ে তাঁর কাব্যজীবন শুরু করেছিলেন, একেবারে শেষের দিকে, মৃত্যুর তিন-চার বছর আগে থেকে প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যে-ধরণের কবিতা রচনা করেছিলেন, আবার তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এই সরল চিত্রলতায়, অবশ্যই অনেক পরিণতভাবে, অনেক বেশি ধীরোদাত্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র 'সংকলিতা' কাব্যসংকলনে (১৯৩৩-১৯৩৯) রোমান্টিকতা এবং রোমান্টিকতার সঙ্গে যুযুধান অ-রোমান্টিকতা—এই দুই উপলব্ধির কবিতাই পাই, যদিও আমার ধারণা যে শেষাবধি রোমান্টিক অনুভূতিই অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এই সংকলনে। "পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে / স্বনের ফটিক ঝর্ণা তলে" (ভোর); "তারা শুধু একা—নদী আর চর, আকাশ আলো / ভোরের মত" (নদী); "তোমার চোখ হোক আরো নীল / চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মত" (নীলিমাকে); "ভোরের চাঁদ পদ্মমধুর মতো লাল" (পদ্মাকে); "আমার দেহ / ফুলের গন্ধ হ'ল কি ক'রে?" (আকস্মিক); "কত যুগ গেল যাবে আরো কত যুগ / কত মেঘ, কত ব্যথা।" (মেঘ)/—প্রভৃতি পঙক্তি যেমন রোমান্টিক মেজাজের সাক্ষ্য দেয়, তেমনি উল্টোদিকে আমরা পাই অ-রোমান্টিক, 'সমাজসচেতন' পঙক্তিগুচ্ছ: "বেজে উঠল হঠাৎ মোটরের তীক্ষ্ণ হর্ন —মিথ্যে কথা রাজকন্যা তো জাগেনি"/(নিশীথ-নগরী); "ফিরে যাই ঘরে/ জলছে যেখানে নতুন দানব / ইলেকট্রিসিটি।" (ইলেকট্রিসিটি); "দাও আমাদের আকাশকে ইস্পাত মুড়ে—/ বিদ্যুতে জলুক আমাদের সূর্য, / কার্বন ডায়োক্সাইডে ভরে যাক হাওয়া, / আমরা বেঁচে থাকি ক্লাইভ স্ট্রীটের দালানে / বেঁচে থাকি কংগ্রেসে আর সিনেমায় / (প্রেতায়িত); "আর ফুলের গন্ধ নয়, পৃথিবী,/ ভালো লাগে এবার / ঘামের গন্ধ— /" (ঘাম); ইত্যাদি। এই দ্বিতীয়োক্ত পর্যায়ের দুটি কবিতার দুটি স্তবক আমি অন্য কারণে নিচে উদ্ধার করছি:

১. "শহরের বসন্ত ঘোরে
বুইক-বেঞ্চ-বেলিলার চাকায়—
ওরা তখন চেয়ে থাকে কাবাবের মাংসের দিকে
আর ওদের মাংসে ওড়ে মাছির ঝাঁক।" (ওরা)

ঈষৎ পরবর্তী যুগের সমর সেনের কবিতার কথা কি মনে পড়ে না?

২. "চীনের সবুজ ক্ষেত এসে বাঙলায়
মিলেছে হয়ত কখন অলক্ষিতে—
মার্সাই আর বার্সিলোনার ঢেউ
ভিড়েছে কখন বোম্বের বন্দরে!" (আজ)

এই কবিতা পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতার কথাও হয়তো মনে প'ড়ে যেতে পারে।

"প্রাচীন প্রাচী" (১৯৪৬-৪৮)-র 'এশিয়া', 'ভারতবর্ষ', 'বাঙলা', প্রভৃতি কবিতায় কবির যে ঐতিহ্যচেতনা ও ইতিহাসবোধ আমাদের চোখে পড়ে, পরবর্তী যুগের অনেক কবিতায় তা আরো প্রবলভাবে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে ডিগ্রি করেছিলেন—সুতরাং তাঁর অধীত বিদ্যা কবিতায় প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। "ভারতবর্ষের জন্ম হ'ল।/ গন্ধার-কেকয়-মদ্র-উশীনর-মৎস-কুরু-পঞ্চাল-কাশী-কোশলের জন্ম হ'ল," ইত্যাকার পঙক্তি যেমন তালিকামাত্র মনে হয়, অন্যদিকে 'বাঙলা' কবিতার "গঙ্গা! কালো অরণ্যের চোখে বিদ্যুৎপ্রভা—/কোন্ কালো মানুষের মনে বিদ্যুতের মতো এসেছিল তার নাম?"—পঙক্তি কটির চিত্ররূপময় আবেগ আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। "অপ্রেম ও প্রেম" কাব্যগ্রন্থের 'পারমিতিহাস' কবিতায় এই ইতিহাস-চেতনার যে ঈষৎ অনচ্ছ অথচ ছন্দোময় প্রকাশ ("ইন্দ্রাণী হতে চাও তুমি শবরী মেয়ে উর্বশী-সাধ নেই কেন এই / শবরীর লীলা" ইত্যাদি) আমরা লক্ষ্য করি, তারই পরিণত ফলশ্রুতি আমরা পাই পরবর্তী যুগের "উর্বর উর্বশী" কাব্যগ্রন্থে, যেখানে fertility cult-এর সূত্র-অন্বেষণে তিনি সচেতনভাবেই এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যাণ্ড"-কে অনুসরণ করেছেন, এবং এই অনুসরণ খুব সার্থক হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না।

কিন্তু "নতুন দিন"-এর (১৯৪৭) অনেক কবিতায় ("প্রথম শিশুর নাম / বলে গেল একদিন স্বপ্নের আকাশ, / ধানের মঞ্জরী দিয়ে লিখে গেল হেমন্তের স্মরণীয় কোনো সূর্যোদয়।" (নতুন দিন); "ফুরোয় কি পৃথিবীর দিন? / সূর্য আছে, দেহতটে আছে তাই নতুন জোয়ার" (যুদ্ধোত্তর); "প্রিয়ার চোখের মতো রোমাঞ্চিত মায়া, / ছিল রৌদ্র ঘুম-ভাঙা—রোদের নরম কিশলয়" (২৬শে জানুয়ারী)। সঞ্জয় ভট্টাচার্য রোমান্টিকের মতোই সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতাকে বন্দনা করেছিলেন। "যৌবনোত্তর" (১৯৪৩-৪৮) কাব্যগ্রন্থে তিনি যে বিষাদ-বেদনার কথা লিখেছেন, তারও প্রধান সূত্র রোমান্টিসিজম ("আমার সে-মন নেই / যে-মন সমুদ্র হতে জানে" (যৌবনোত্তর); "ছিল যেন জীবনের অতলে কোথায় / কতো

কতো ছায়া! / সে ছায়ার কথা, ছবি, আকাশ, সময় / কোলাহল থেকে ফিরে / হৃদয়ের কাছে দেখা যায়" (হৃদয়)। "অপ্রেম ও প্রেম"-এ তিনি আবার পুরোপুরি রোমান্টিকতায় নিজেকে প্রত্যর্পণ করলেন, যে গ্রন্থ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন "এই বইতে অপ্রেমের চেয়ে প্রেমের অংশই বেশি"। "একটি সবুজ মেয়ে ভেঙে গেছে কাচের মতন / হয়ত কখন! / সবুজ আলোর কাচ মিশে গেছে আষাঢ়ের রোদে—" (সবুজ মেয়ে); "তুমি—আমি অন্ধকার—সন্ধ্যা! / তুমি-আমি নদীর গন্ধ—সন্ধ্যা!" (সন্ধ্যা); "তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার; / অপলক চোখ যেন কার / তোমার চোখের পাশে—হয়ত আমার"— প্রভৃতি পঙক্তিতে এই রোমান্টিকতাই আস্তীর্ণ হ'য়ে আছে।

আমি বলতে চাই এই রোমান্টিকতাই, এই গীতিপ্রবণতাই—অনেক পরিশীলিতভাবে—সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শেষজীবনের কবিতায় উপস্থিত। রোমান্টিকতার সঙ্গে—এই শেষ পর্বের কবিতায়—যুক্ত হয়েছে প্রজ্ঞা, সংক্ষেপে বলবার প্রবণতা, ভিতর-বাহিরের একধরণের নির্ভার ভারসাম্য। এই পত্রিকার এই সংখ্যায় যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। "জার্নাল" কবিতাগুচ্ছে রোমান্টিকতা বহুলাংশেই চিত্রকল্পনির্ভর। 'শরতের শাদা রৌদ্র'-কে "নার্সের অ্যাপ্রণের" সঙ্গে যে তুলনা করা হয়েছে, তা আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে। অসাধারণ মনে হয়েছে "আশীর্বাদ হাত তোলে ঘরের দাওয়ায়। / যে-পথ হারিয়ে গেছে, তাই দেখা যায় অকস্মাৎ"—পঙক্তিদ্বয়ের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি। "যে আগুন ছাই, সেই প্রথম আগুন", "যা আমার বাজেনা হৃদয়ে / রক্তের মতোন, তাকে কাছেও পেলে সে / নেয় না আঙুলে, ভয় দেখায় আলপিনে," "কতোদিন কান্না ভুলে গেছি / সমুদ্রও ভুলে তাই"—এইসব পঙক্তিও আমাদের অন্তঃশরীরে যে অনুরণন তোলে, তা মূলত লিরিকের অনুরণন। তবে উপরিতলের লিরিক নয়, ভেতর-থেকে-উঠে-আসা মননসংপৃক্ত, চিত্রান্ধ, গীতিপ্রবণতা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র যে সর্বশেষ কবিতাটি (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯) এই পত্রিকায় মুদ্রিত হচ্ছে, তা একটি বিশেষ কারণে খুবই আকর্ষণীয়। "তখন আমার নাম ডাকা শুরু হবে / নর্তকী, তোমার পাশে যেতে / আমি অপেক্ষায় আছি ধূসর সন্ধ্যেতে"—পঙক্তি তিনটি পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সেটাও হয়তো বড় কথা নয়, কিন্তু মৃত্যুকে যে "নর্তকী" হিসেবে তিনি কল্পনা করেছেন, তার ব্যঞ্জনা আমাদের মুগ্ধ না ক'রে পারে না। একমাত্র কবিই পারেন ছন্দোরূপময়, জঙ্গম পরিসমাপ্তির কথা অনুভব করতে। তাই নয় কি?

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে আমি একজন প্রথমশ্রেণীর কবি বলে মনে করি। "স্বনির্বাচিত কবিতা"-র ভূমিকায় তিনি যে লিখেছিলেন "সে অবকাশ মানে অনুভবের মুখোমুখি হওয়া অথবা ভাবনার শরীরে আবেগের সন্ধান করা" (বলাবাহুল্য, কবিতা-রচনা বিষয়ে এই মন্তব্য) তা সমস্ত যুগের কবিদের কাছেই অবশ্যমান্য। 'আমার একেবারে কোনো পাঠক নেই'—মৃত্যুর কয়েকমাস আগে সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই উক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই প্রচারসর্বস্ব ঢক্কা-নিনাদের যুগে, নিভৃতচারী একজন প্রথমশ্রেণীর কবিকে যে এই উক্তি করতে হয়েছিলো তা সবদিক থেকেই খুব দুঃখজনক। যাই হোক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র শেষজীবনের অগ্রন্থিত কবিতাগুচ্ছ গ্রন্থাকারে দেখতে পেলে আমরা সুখী হবো।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একগুচ্ছ অপ্রকাশিত কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য রচিত শেষ কবিতা

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

অপেক্ষায় আছি
কখন বিলোল ঠোঁটে ফুটবে যে কথা,
কখন যে পায়ের পাতায়
এক-দুই-তিন বেজে যাবে
ছন্দ পথ নেবে যে কখন।
তখন আমার নাম ডাকা শুরু হবে
নর্তকী, তোমার পাশে যেতে।
আমি অপেক্ষায় আছি ধূসর সন্ধ্যেতে
যাবো ঠিক যাবো
অন্যথায় আপন অশরীরী
রক্ত মাংসে অক্ষমতা জেনে নেবে, বলো।

[এ কবিতাটি কবি মৃত্যুর ঠিক দুদিন আগে রচনা করেন। এই লেখাটিই জীবিত কবির শেষ রচনা।]

জার্নাল

(রচনাকাল ১৩৭৩ সনের ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ)

১

শরতের শাদা রৌদ্র ঘরের দেয়ালে :
নার্সের অ্যাপ্রণ।
বর্ষায় কী রুগ্ন ছিল মন
শিউলি ছিলনা ভেজা ডালে!
দুই হাত শিউলি কুড়োয় :
তোমার শাড়িতে এসে সে রৌদ্র ফুরোয়॥

২

সেই পবিত্রতা ফেরে হঠাৎ হাওয়ায় :
মায়ের পায়ের শব্দ মাটির উঠোনে।
যে দূর্বা গিয়েছে মরে তা-ই যেন বোনে
ধানের সবুজে কোনো হাত।
আশীর্ব্বাদ হাত তোলে ঘরের দাওয়ায়।
যে-পথ হারিয়ে গেছে, তাই দেখা যায় অকস্মাৎ॥

৩

কাকে আর ছুঁয়ে আমি জানব যে আমি নই তাকে?
তুমি নেই, নেই আর সকালের ডাকে
দুপুরের সমস্ত ছায়ায়,
নেই সেই বিকেলের গাঢ় প্রতীক্ষায়।
কোনো সময়েই আর নেই তুমি, শুধু আমি আমি।
কোন্ ঘাস, আকাশ বা করবে বেনামী!

৪

হয়তো পাহাড় হয়ে আছি।
সে আগুন ছাই, সেই প্রথম আগুন।
বৃষ্টির অসমাপিকা ঘুণ
কাজ করে যায়, তাই হরিণীরা আসে কাছাকাছি।

৫

এখন তেমন আর শুনি নে তো গান।
মাঠে না এবং নদীতে না
যারা চেনা চেনা
তাদের কথায় আর গান নেই, অন্তত শুনিনে।
শুধু শব্দ, শব্দের তুফান
আকাশ কাঁপিয়ে তার ছিঁড়ে যায় বীণে।

৬

সব যায় ট্র্যাম-ট্রেন-প্লেন।
সব থাকে কাফে ও হোটেল।
কিছুই হল না লেনদেন
কতো বর্ষা বসে আছি নিয়ে যুঁই-বেল॥

৭

ঘরের রূপসী বাল্‌বে সোনালি ফড়িং
আত্মহত্যা করে
আলো নিবিয়েও বুঝি ছিলনা নিস্তার
ছায়া আর শত শত আত্মহত্যা ঘরে।
কপাটে অরণ্য অন্ধকার
মনে পড়ে সোনার হরিণ।

৮

সব শব্দ ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হয়ে
ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছে।
কোনো ভালো লাগা আর শব্দ দিয়ে বোঝাতে পারিনে।
যা আমার বাজে না হৃদয়ে
রক্তের মতোন, তাকে কাছেও পেলে সে
নেয় না আঙুলে, ভয় দেখায় আলপিনে।

৯

আমার চোখের রৌদ্রে থাক এ আকাশ,
আমার চোখের অন্ধকারে থাক খ্যাত নীলশাড়ি।
অন্ধকার সমুদ্রেই অতীত স্নানের অবকাশ
এবং যে কোনো রৌদ্রে সেই শাড়ি মেলে দিতে পারি!
তুমি ছিলে অথবা ছিলেনা
পাওয়া না-পাওয়ার সেইসব লেনদেন।
রৌদ্রের হিসেব নেই, রৌদ্রই আকাশ।
একটি নদীর মতো ফেলুক বা না-ফেলুক শাড়ি মৃদুশ্বাস।

১০

কেউ ছিল হেনার বাগানে
কেউ ছিল বকুলের তলে
সব ছবি মুছে গেছে সময়ের জলে
কেন যে মেশায় মন প্রাণে ও অপ্রাণে
কেন যে চোখের অন্ধকারে
এখনো ফুলের গন্ধ আসে
আর সেই গন্ধ মেয়ে-শরীর হতে বা ভালবাসে!

১১

সব পাপ মনে এনে তোমার পা ছুঁই।
ফুটল কি যূঁই—
তোমার হাসিতে যূঁই ফুটল কি তবে?
জল স্বরগরল কি ফুলের সৌরভে!

১২

একটি সন্ধ্যার পাখী উড়ে উড়ে তারা হয়ে গেল।
একটি সন্ধ্যার ফুল চলে গেল ফুলের দোকানে
কে আর কাকে বা তারপর মনে আনে?
রাত্রি থাকে সকাল, বিকেলও।

১৩

কতো দিন, কতোদিন বসে থাকা যায়,
পথের কিনারে!
চোখ বুঁজি, চোখ মেলি কেন বারেবারে
কার প্রতীক্ষায়,
তাও তো জানিনে!
কবে ঝড় লাগবে এ তৃণে
পথ হবে নদী,
ভেসে যাওয়া যাবে কবে সমুদ্র-অবধি!

১৪

নিসর্গ আমার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা।
নগর তো রমণীর সুখ
তার আপ্যায়নে রাজসুখ
চায় না এ ভিলা!

১৫

এখনো পাথর ছুঁলে অস্পষ্ট আঙুলে
সমস্ত অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে:
মৃত এক বৃক্ষ লক্ষ বসন্তর ফুলে
আনন্দিত উনিশ শ' ছেষট্টির ঠোঁটে।
অফুরন্ত শব্দ তার আকাশে আকাশে
মৃত ও জীবিত রৌদ্রে ঘোর অনায়াসে।

১৬

কতোদিন কান্না ভুলে গেছি!
সমুদ্রও ভুলে গেছি তাই।
হলো না সৈকতে আর ঠাঁই
বালিকে পাথর করে হাটে নিয়ে বেচি॥

শিল্পভাবনা

পরিপ্রশ্ন প্রণতি পরিগ্রহণ

—ব্রেশ্‌ট সমালোচনার বিভিন্ন বিন্যাস

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক জর্মন সমালোচনা-সাহিত্যে সমালোচনা শব্দটির ব্যবহার ও চাহিদা ততোটা আর লক্ষ করা যায় না। তার জায়গায় নানামুখী প্রত্যাশা ও প্রচ্ছায়া নিয়ে উঠে এসেছে আরেকটি শব্দ: Rezeption বা পরিগ্রহণ। এই শব্দটি ব্রেশ্‌টের নিজেরও প্রিয় শব্দ, কেন না পাঠক বা দর্শক কীভাবে একটি শিল্প-কর্ম গ্রহণ করেন সেটা তাঁর নন্দনতত্ত্বের একটি জরুরি অংশ, সন্দেহ নেই। শব্দটির ব্যাখ্যাসূত্রে এরকম দাবি করা হয়েছে, এই পরিগ্রহণ হলো মূলত একরকমের gehobene Liebhaberei বা উন্নত ধরনের নেশা, কিংবা যাকে হাল্‌কা ভঙ্গিতে বলা যায়, 'হবি'। অবকাশের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে এই নেশা, নিছক নিথর যুক্তি দিয়ে তাকে হয়তো সব সময় প্রতিপন্ন করা যায় না।

ব্রেশ্‌টের মৃত্যুর পর দুদশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এবং সেই সূত্রে বেড়ে গেছে তাঁর অপ্রতিরোধ্য পাঠকপ্রিয়তা। আর তাই এই অবকাশের আলোয় তাঁকে মূল্যায়িত করার বিভিন্ন ধরন বা বিন্যাস আমরা এখন সহজেই চিনে নিতে পারছি। সমস্ত মহৎ সাহিত্যকর্মীর মতো প্রধানত তিনি নিজেই তাঁকে সনাক্ত করবার সূত্রগুলি উপহার দিয়ে গিয়েছেন। উদাহরণ সমেত এই সূত্রগুলির একটি নির্বাচিত তালিকা তৈরি করা যেতে পারে:

১. ধ্রুপদী পন্থা (১৯৫০ সালে, উদাহরণত 'জননী' Die Mutter নাটকটিকে

(ব্রেশ্‌ট ৮০ উৎসবে মাক্সমূলার ভবনে প্রদত্ত চতুর্থ ভাষণের সংক্ষিপ্তসার)

মূল্যায়িত করতে গিয়ে নিজেই তিনি বলছেন: এটি একটি ক্লাসিক যুগেরই কবিত্বময় উপস্থাপন)। মনে রাখা ভালো, ব্রেশ্‌ট সমালোচনায় Bildungsklassiker—বা 'প্রশিক্ষক ধ্রুপদী' শব্দটির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ ব্রেশ্‌টের মনঃপূত ছিল

২. সময়োচিত প্রাসঙ্গিকতা তথা সামাজিক বাস্তবতা (যে-অর্থে তিনি তাঁর একাধিক নাটক যুদ্ধোত্তর নানা দেশের জন্য নতুন করে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন)।

৩. উত্তেজক প্রোগ্রাম বা প্রকল্প হিসেবে শিল্পের মূল্য ('প্রোপাগাণ্ডা' শব্দটিকে না এড়িয়ে গিয়ে এ-সম্পর্কে তিনি ১৯২২-এ তাঁর এক্সপ্রেশনিস্ট নাটক 'রাতের কাড়ানাকাড়া' (Trommeln in der Nacht) লেখার পরবর্তী পর্ব থেকে শুরু করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসংখ্যবার নানা বিবৃতি দিয়েছেন)

৪. এবং এরই পাশাপাশি উপভোগ্য শিল্প হিসেবে শিল্পের মূল্য (উদাহরণ, স্পষ্ট করেই ব্রেশ্‌ট নিন্দাভরে বলছেন: 'আদর্শবাদ আদর্শবাদ আর আদর্শবাদ—হায় রে, কোথাও এতটুকু নান্দনিকতার নামগন্ধ নেই, গোটা ব্যাপারটাই যেন স্বাদহীন খাদ্যের বর্ণনার মতো')

৫. Salon Marxism বা ফ্যাশান-দুরস্ত বৈঠকী মার্কসবাদ বিষয়ে সতর্কতা। 'কাজের কড়চা'য় তিনি এটিকেই 'অভিজাত প্রোলেটারিয়টপনা' বলে অভিহিত করেছেন

৬. এপিক থিয়েটার সম্মত V-effekt বা দর্শকের বিযুক্তি-প্রক্রিয়ার সেই বিখ্যাত মানদণ্ড, যার একটি ফল দর্শক বা সমালোচক পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন রচনা। (১৯২৮-এর পর থেকেই এ-সম্পর্কে তাঁর উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রাচুর্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায়)

৭. নিজস্ব ঘরানায় অন্যদেশী উত্তরাধিকারের রূপান্তর। এই সূত্রে উল্লেখ্য তাঁর প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্র তথা জাপানী ফিলমের টেকনিকের স্বীকরণ এবং সেই ভূখণ্ডের শিল্পচেতনায় তার প্রয়োগ

৮. সেন্সরধর্মী সমালোচনা (No writer of this century has censored himself so rigorously as Brecht—David Caute).

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন দেশে ব্রেশ্‌টকে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে গিয়ে ব্রেশ্‌টীয় এই সূত্রগুলিই কমবেশি গৃহীত হয়েছে। তার ফলে তাঁকে বিকৃত করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই মাথা না ঘামিয়ে এই কয়েকটি সূত্রের প্রযুক্তির

প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে দুটো কথা মনে রাখতে হবে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রেশ্‌টের নির্দেশিত ক্যাটিগরির কথা প্রযুক্তির মুহূর্তে তেমন মনে রাখা হয়নি। দ্বিতীয়ত, আপাতত আমরা ব্রেশ্‌টীয় প্রযোজনার মানচিত্র থেকে প্রধানত কয়েকটি অঞ্চল নির্বাচন করে নিতে পারি। যেমন :

১. দক্ষিণ ইয়োরোপ থেকে—মূলত ইতালি

২. উত্তর ইয়োরোপ থেকে স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়ার দেশপুঞ্জ এবং ইংল্যাণ্ড

৩. ইয়োরোপের মানচিত্রে তাকালে পূর্বাঞ্চল : রাশিয়া

৪. পুব ও পশ্চিম জার্মানি ; এবং প্রসঙ্গতএই দুয়ের মধ্যে দ্বিধান্বিত আরো একটি পূর্বাঞ্চল—রুমানিয়া।

আলোচনার শুরুতেই আর একটা কথা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। আমরা যাকে ওস্ট ব্লক বলে চিহ্নিত করে থাকি সেটাও এই প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের মতোই একটি অস্পষ্ট ধারণা। এই অঞ্চলে ব্রেশ্‌ট স্বভাবতই সাংস্কৃতিক পোপের মতো সর্বময় মর্যাদায় অঙ্কিত। কিন্তু রাজোপম এই উপাধির আপাত-আস্তর সরিয়ে নিলে দেখা যাবে এই ভূখণ্ডের একএকটি অংশে ব্রেশ্‌টের আদল এক-একরকম। অর্থাৎ ওস্ট ব্লকের কাছে ব্রেশ্‌ট প্রতিষ্ঠান নন, আত্ম-উদ্ঘাটনের এক সজীবতম উপলক্ষ।

ইতালিই সম্ভবত ব্রেশ্‌টীয় মানচিত্রের সেই একমাত্র দেশ, যেখানে আমাদের উল্লিখিত সবগুলি সূত্র একই সঙ্গে সার্থকতম, যদিও বা, যাকে আমরা শাদা বাংলায় বলি এলোপাথাড়ি ধরনে, প্রযুক্ত হয়েছে। ব্রেশ্‌টের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর থেকেই ভেনিসের বিয়েনাল বা দ্বিবার্ষিকী শিল্পউৎসবে ভার পড়েছে ব্রেশ্‌টের। কিন্তু চতুঃশক্তির আয়োজিত সকরসংস্থার প্রচ্ছন্ন মন্ত্রণায় এবং সম্ভবত কমন মার্কেটের একটি ছদ্ম-দর্শন তৈরি করে নেওয়ার গরজে পুব বার্লিনের নাট্যসংস্থা 'বের্লিনার আঁসাবল্‌' ১৯৬৬র আগে সেখানে প্রযোজনার অনুমতি পায়নি, এই অভিযোগ সম্ভবত মিথ্যে নয়। এর ফলে ভেনিসে যখন ব্রেশ্‌টের মৃত্যুর দশ বছর পর, 'আতুরো উই'র অভিনয় সম্পন্ন হতে পারল, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান লুইজি লঙ্গো যে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে বসলেন, তার সারমর্ম ছিল ব্রেশ্‌টের মৃত্যুর দশ বছর পর তাঁকে ঘিরে ব্যক্তিগত স্মৃতির উদ্দীপন। এবং তাঁর রচনাকে সমস্ত রাজনৈতিক উপলক্ষ থেকে সরিয়ে শুধু শিল্প হিসেবে দেখতে হবে, এই আকাঙ্ক্ষাও তার মধ্যে অনুক্ত ছিলনা। মনে রাখতে হবে, এই বিবৃতির মধ্যে কোথাও কোনো দরবারি ক্রিয়াকাণ্ডবারিধির ছায়া পড়েনি। প্রসঙ্গত আপাত-তুচ্ছ

এই তথ্যটিও স্মরণযোগ্য, কার্লো পন্টি এবং সোফিয়া লোরেন—আধুনিক' কথা-চিত্রের একজন সার্থকতম প্রযোজক এবং এক অভিনেত্রী এই উদ্‌যাপনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে গিয়ে অকারণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই মুহূর্তে, 'বের্লিনার আঁসাবল্‌'-এর কাছে পাঠান তাঁদের টেলিগ্রামে প্রতিপন্ন হয়েছিল, তাঁদের অনুশীলিত বৈঠকী মার্কসবাদ ; অন্যদিকে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি লুইজি লঙ্গের টেলিগ্রামে স্পষ্টতই ব্রেশ্‌টের শিল্পকে তার স্বনির্ভর আবেদনে মূল্যায়িত করার আগ্রহটিও সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

ভেনিসের নাটমঞ্চে সেদিন দ্বিগুণতর সার্থকতায়, ব্রেশ্‌টের পাশাপাশি, অভিনীত হয়েছিল, মোলিয়েরের 'তার্তুফ' নাটকটি। ভেনিসের পঞ্চবিংশতি গদ্য-নাট্য উৎসব অথবা Festival Internazionale del Teatro di Prosa-র অনুষ্ঠানে ব্রেশ্‌ট তবুও তখন মোলিয়েরের চেয়েও বড়ো নাট্যকার হিসেব গণ্য হয়েছিলেন প্রধানত এই দুটি কারণে :

প্রথমত, ব্রেশ্‌ট এমন একজন ধ্রুপদী লেখক যাঁকে ইচ্ছেমতো দেশজ প্রয়োজনে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়া যায়।

দুই, মিলান-শহরে Piccolo-theater-এর জ্যর্জিও স্ত্রেলার এবং পাওলো গ্রাসি—এই দুই নাট্যপ্রযোজক দেশজ নাট্যআন্দোলনের বিবর্তনের তাগিদে ব্রেশ্‌টের 'তিনপয়সার পালা'র প্রযোজনায় শুধু তাঁদের কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েই তাঁদের কর্তব্যের সমাপন রেখা টানেন নি, তাঁরা ভাবছিলেন ব্রেশ্‌টীয় নাট্যচিন্তাকে কী ভাবে তাঁর স্বদেশের নাট্যপ্রবর্তনায় নতুন অর্থে কার্যকরী করে তোলা যায়। তাই, সম্প্রতি হামবুর্গে জ্যর্জিও স্ত্রেলার যখন 'সেৎজুয়ান' প্রযোজনায় ব্রেশ্‌টীয় V-effekt বা বিযুক্তিকরণ-প্রক্রিয়ার ব্যবধান-অভিঘাতের প্রমাণ দেখালেন, তার পিছনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল একটি সাম্প্রতিক বিশ্বজনীন উত্তরাধিকার যা ব্রেশ্‌টেরই দান।

তৃতীয়ত, রোবার্তো দে মন্তিচেল্লি 'Il Giorno' পত্রিকার অগ্রণী সমালোচক, তাঁর সমালোচনায় লক্ষ করেছিলেন, Arturo Ui-এর প্রযোজনায় একাধারে প্রাচ্য নাটকের মুদ্রা ও সদ্য ক্লাসিক-হয়ে-ওঠা চ্যাপলিন-এর পর্যায়ভুক্ত শিল্পকর্মের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এই নাটকের সফল প্রযোজনা প্রমাণ করেছে ব্রেশ্‌ট একাধারে চিরায়ত অর্থাৎ সময়হীন এবং সময়োচিত। এর সঙ্গে তুলনা করে দেখতে গেলে এই উৎসবে অভিনীত অন্য নাটক আরিস্তোফেনেসের 'পাখি' না-চিরায়ত, না-আধুনিক।

ইতালি সেদিন ব্রেশ্‌টকে শুধু সদর্থক অনুভূতির অর্চনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি।

'তিন পয়সার পালা'র অভিনয়ের শেষে, একাধিক সমালোচক জানিয়েছেন, এরিখ এঙ্গেল্-এর প্রযোজনায় সেই প্রকল্পধর্মী সমাজচেতনার অনটন ঘটেছে, ১৯২৮-এর প্রথম অভিনয়ে বা ইতালির পরিচালক স্ত্রেলারের ১৯৫৬ সালের প্রযোজনায় যার প্রাচুর্য দেখা গিয়েছিল। এই সূত্রে উত্তেজনা এতদূরই গড়ায় যে, ভেনিস-উৎসবের আনন্দপ্রাঙ্গণ সেদিন শেষ পর্যন্ত একটি সেমিনারমঞ্চে পরিণত হয়। দু-দিন ব্যাপী Tavola Rotonda বা গোল টেবিল আলোচনার দুটি বিষয় ছিল; যথাক্রমে 'ব্রেশ্টের নাটকে ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাস', এবং 'ইতালিতে ব্রেশ্টের নাটকের নিয়তি'। বের্তোলুচ্চি'র তীব্র সমালোচনায় প্রমাণিত হয় কবি ব্রেশ্ট এবং কমিউনিস্ট ব্রেশ্টকে আলাদা করা যাবে না, দুজনকেই একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র সত্তার অন্তর্গত হিসেবে দেখতে হবে।

ইতালির সমালোচকের এই প্রত্যাশা কি স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার দেশগুলিতে পূর্ণ হয়েছিল? ১৯৩৩-এ নাৎসিদের কালো তালিকাভুক্ত যে ব্রেশ্ট তাঁর বাস্তুহীনপর্বে সুইৎজারল্যাণ্ড ঘুরে এই দেশপুঞ্জে এসে ১৯৪১-এর ১৩ই জুলাই পর্যন্ত স্নিগ্ধ আশ্রয়ের ছাউনি পেয়েছিলেন। এখানেই, ফিন্ল্যাণ্ডের প্রধান শহর হেলসিংকিতে 'সেৎজুয়ানের ভালো মানুষ'কে রূপ দিয়েছেন এবং এখানেই সমালোচক হিসেবে তাঁর নিজস্ব ভাবসূত্রগুলি ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ ঘটেছিল ব্রেশ্টের। কিন্তু হেলসিংকিতে বার্লিনের Volksbühne বা লোকমঞ্চে যখন ১৯৭১-এ একই নাটক, 'সেৎজুয়ানের 'ভালো মানুষ' মঞ্চস্থ করতে এল, তাঁকে ভিতর থেকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। এর্নস্ট শুমাখার, পূর্ব বার্লিনের সাংবাদিক, এই দলের সঙ্গে তখন সফর করছিলেন। তিনি ভিতরের ঐ বাধার লক্ষণ বোঝাতে গিয়ে এই কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করেছেন:

সন্দেহ নেই, তিনি বলছেন, পূর্ব জার্মানিকে উত্তরাঞ্চলের এই দেশগুলি সেদিন ব্রেশ্টের নাট্যপ্রযোজনা উপলক্ষ করেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছিল—কিন্তু সেটা বাইরের ঘটনা। ভিতরের দুটো ঘটনা একান্ত উল্লেখযোগ্য। এক, ফিনল্যাণ্ডের ৬০,০০০ বেকারদের মধ্যে একজনও ১০-২২ সেপ্টেম্বর / ১৯৭১ এর অভিনয় দেখবার সুযোগ পায়নি। অভিনয় হয়েছিল রাজধানীর কলামন্দির-প্রতিম শৌখিন নাট্যসদনে, যেখানে বার্ষিক বুর্জোয়া গ্রাহকেরা ভালোভাবে খেয়েদেয়ে এসে নাটকটি, যাকে বলে, উপভোগ করে বাড়ি ফিরে গেছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো প্রচ্ছন্ন, সেজন্যই আরো তির্যক, তাৎপর্যময়। এই প্রযোজনার সদ্য-আগে য়োনেযু অঞ্চলের তরুণ পরিচালক য়োকা তুর্কা গর্কি। ব্রেশ্টের 'জননী'

নাটকটি ফিনিশ উপভাষায় রূপায়িত করতে গিয়ে তার মধ্যে ধনতন্ত্রে স্বাভাবিক নির্যাতিত বেকার ও মজুরদের দুর্দশা ফুটিয়ে তুলেছিলেন বলে নাট্য-পরিচালক হিসেবে সরকারি এস্টাব্লিশমেন্ট-এর পক্ষ থেকে তাঁকে রাতারাতি বরখাস্ত করা হয়। সংবাদদাতা শুমাখার এখানে ন্যায্য প্রশ্ন তুলেছেন, কী করে এমন একটি পরিবেশে ব্রেশ্টের নাটক আদৌ অভিনীত এবং গৃহীত হতে পারে?

মজাটা হচ্ছে এই, ব্রেশ্ট এই ফিনল্যাণ্ডেই সেই মুহূর্তের গর্ব ব'লে প্রদর্শিত হচ্ছিলেন। যে-বাড়িতে বসে 'সেৎজুয়ানের ভালো মানুষ' লিখেছিলেন, সেটিকে অনতিকাল পরেই একটি স্মৃতিতীর্থে পরিণত করা হয়েছিল। ফলত, ব্রেশ্টকে দেখা হয়েছিল অনেকটা সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায়। এবং ভুলভাবে তাঁকে প্রশংসা করার মাত্রাটা সেদিন বেড়ে গিয়েছিল আচম্কা। তার ফলে আগের রাতে অভিনীত মার্কিন মিউজিক্যালের আলোয় বিচার করা হয়েছিল পরের রাতে অভিনীত 'সেৎজুয়ানের ভালো মানুষ'কে। সুইডিশ ভাষায় শ্রেষ্ঠ মুখপত্র হুফ্উড্স্টাট্ব্লাডেড-এ কাইসা ক্রুক-এর মতো তীক্ষ্ণধী সমালোচকও শেষ পর্যন্ত এই এরকম ঠাউরে বসেছিলেন, এই তো হলো সত্যিকারের শিল্প। প্রোগ্রাম নয়, প্রমোদ। অভিনয়ে মুদ্রা আর মুখোশের নিপুণ ব্যবহার দেখতে-দেখতে তাঁর মনে হচ্ছিল, কমিউনিস্ট ব্রেশ্ট আর শিল্পী ব্রেশ্টকে যদি এখনই আলাদা করে না নেওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতের ব্রেশ্টের কপালে প্রোপ্যাগাণ্ডাধর্মী বিকৃতি আর দুর্গতি ছাড়া আর কিছুই পাওনা থাকবে না।

প্রসঙ্গত আরো একটি সংবাদ এখানে প্রাসঙ্গিক। পূর্ব জার্মানির নাট্যদলও সেদিন মূল নাটকের উত্তেজক অনেকগুলি অংশ ছেঁটে নিয়ে উপভোগ্যতার উপরেই বেশি জোর দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, তাঁর নাট্যপ্রযোজনায় নানা প্রয়াসে এখান ব্রেশ্টেরও মনে হয়েছিল উত্তেজক প্রোগ্রাম আর উপভোগ্য প্রকরণের মধ্যে অন্তত সাময়িক একটি বিচ্ছেদ না ঘটালে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার হৃদয় জয় করে নেওয়া যাবে না। এরকম রফা তিনি শেষ পর্যন্ত করে ওঠেন নি, সেটাও আমাদের সবার জানা। ওখানেই যদি উত্তরাঞ্চলে ব্রেশ্টের নিয়তি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যেত, তাহলে লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। সদ্য-উদ্ধৃত সমালোচনার শেষে একটি সংকেত উচ্চারিত হয়ে উঠেছিল। ব্রেশ্টের থিয়োরি ও নাটকে ব্যক্তির বিযুক্তি-করণ এবং একই সঙ্গে প্রাত্যহ জীবনের বিগ্রহ ফুটে উঠতে পারে, এই মর্মেও সমালোচক কয়েকটি কথা বলেছিলেন। ১৯৭৩-এর ১৩ থেকে ২০ জানুয়ারিতে যখন বার্লিনের একই নাট্যদল একই নাটক নিয়ে হেলসিংকিতে পৌঁছুল, তখন

ব্রেশ্‌টের দৌলতে পুব জর্মন প্রজাতন্ত্র ইয়োরোপের উত্তরাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছে। আর সেই সঙ্গেই সং ব্রেশ্‌টীয় উত্তরাধিকারের অস্বস্তি সত্ত্বেও ডেনমার্ক কমন মার্কেটের সদস্য হতে পেরেছে। এবং নরওয়ের রাজা ওলাভ এবং যুবরাজ ব্রেশ্‌টের শৌখিন ভক্ত হয়ে উঠেছেন, কেননা সেটাই সেই মুহূর্তের রেওয়াজ। এঁদের দুজনেরই অন্যতম বাসনা ছিল, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে ব্রেশ্‌টের নাটক-অভিনয় যেন সার্থক হতে পারে।

বলা বাহুল্য, তথাকথিত এই রাজকীয় স্তরে নয়, নিতান্ত সামাজিক স্তরে ব্রেশ্‌টকে নিয়ে এক ধরনের নতুন চেতনা এই দেশগুলোতে তখন কাজ করছিল। আর তাই, পুব জার্মানির দ্বিতীয় সফর উপলক্ষে একটি বিরাট আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছিল। যোগ দিয়েছিল ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড। বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল একটি জিজ্ঞাসা: ব্রেশ্‌ট—Klassiker oder Gebrauchs ammatiker, অর্থাৎ ব্রেশ্‌ট কি নিছক ধ্রুপদী, নাকি তিনি এমন নাট্যকার যাঁকে আমাদের কাজে লাগানো যেতে পারে? এই সেমিনার নিঃসন্দেহে ইতালিতে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকের চেয়েও নতুন রাস্তা তৈরি করতে পেরেছিল। নরওয়ের ট্রমসো অঞ্চল থেকে একটি নাট্যদল, আচমকা, সেমিনারের শেষে ডেনমার্কে লেখা ব্রেশ্‌টের নাটক Dice Gewehre der Frau Carrar (শ্রীমতী কারারের অস্ত্রশস্ত্র) ব্রেশ্‌টীয় ব্যবধান-অভিঘাতের তাগিদেই অভিনয় করে বসে। একচেটিয়া বৈদেশিক পুঁজিতন্ত্রের কবলে মাছের ব্যাবসার দুঃসহ পরিণতি—এই ছিল তাদের অভিনয়ের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ। নরওয়ের ছেলেদের দুর্দশা নিয়ে একটি কথাচিত্র আর নাটক পরিবেশিত হবার পর পুনর্বার ব্রেশ্‌টের মূল নাটকটি অভিনীত হলো। পুরো ব্যাপারটাই, মনে রাখতে হবে, ব্রেশ্‌টের ধরনে অভিনীত বা প্রযোজিত হয়েছে। সুইডেনে ১৯৪০-এর ১৪ই জানুয়ারিতে ব্রেশ্‌ট তাঁর ডায়রিতে লিখছেন:

'হেলি নাইমা ভিফ্‌স্ট্রাণ্ডের সঙ্গে ওদের নাটকের ইশকুলে কাজ করছে। শেক্সপীয়রচর্চা—ম্যাকবেথের একটি দৃশ্যের (২।২) মহড়া চলছে, তারপর দৈনন্দিন জীবন-থেকে-উঠে-আসা একটি নাট্যদৃশ্যের উদ্ভাবনায় মিশে থাকছে একই নাটকীয় উপাদান, অতঃপর আবার শেক্সপীয়রীয় দৃশ্যটির পুনরাভিনয়। ছাত্রেরা ব্যবধান-অভিঘাতের (V-effekt) আঙ্গিকে বেশ ভালোভাবেই সাড়া দিচ্ছে (সবিস্ময়ে পাঠ করো!)' [অনুলেখ: ব্রেশ্‌টের সুইডিশ ভাষান্তরণের জন্য পরিচিত নাইমা-র নাটকের-স্কুলে-হেলেনা ভাইগেল-ব্রেশ্‌টের হেলি-নাটক অভিনয়

শেখাতেন। উল্লিখিত দৈনন্দিনের দৃশ্যটি 'দ্বাররক্ষীর ভবনে হত্যা' বা Mord im Pförtnerhaus-এর অংশ]

এর ফলে দেখা যাচ্ছে, ধনতন্ত্রী দেশগুলিতেও, ব্রেশ্‌টের নাট্যনিরীক্ষার সার্থকতা ক্রমশই প্রমাণিত হচ্ছে। ব্রেশ্‌টের প্রিয় বিযুক্তি-আঙ্গিক যে এই সূত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে, সেটাও নিশ্চয়ই প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রে অভিনীত ব্রেশ্‌টের 'করিওলান' (Coriolan) ও 'শহুরে জঙ্গলে' (Im Dickicht der Städte)—এই দুটো নাটকই যে এই দেশগুলিতে আদৌ গৃহীত হয়নি, সেটাও ভুলে গেলে চলবে না। প্রথমোক্ত নাটকটি একই সঙ্গে 'রাজনৈতিক প্রোপ্যাগাণ্ডা' ও 'পুরুষালি ব্যালে' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সনাক্ত হয়েছে Breckett থিয়েটার হিসেবে; শব্দটি Brecht ও Beckett-এর একটি জোড়কলম, এবং এখানে মনে রাখতে হবে একই মুহূর্তে Brecht-এর নাটকের পাশাপাশি অ্যাবসার্ড নাটকের অভিনয়। ফরাসি মঞ্চায়নেও এটি প্রচলিত একটি ঘটনা—নাট্যমঞ্চে আজ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এই মূল্যায়ন থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে ব্রেশ্‌টের নাট্যাভিনয়ের একটি নতুন প্রায় বৈপ্লবিক ঘরানা তৈরি হচ্ছে এখন। ভুল বোঝাবুঝির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে এখানে যথার্থ ব্রেশ্‌টীয় ঐতিহ্য। প্রসঙ্গত নাট্যপরিচালক ও সমালোচক রুট টোমাসেন মন্তব্য করেছেন, 'ব্রেশ্‌ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে পরস্পরবিরোধী মনোভঙ্গি আর বিরোধাভাস দেখা দিতে বাধ্য। আর সেই সঙ্গে একই নাটক রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল শিবিরে যে দুরকম প্রতিক্রিয়া তুলবে তার চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা কী হতে পারে? সত্যি বলতে কি, আজ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে ব্রেশ্‌টকে নিয়ে যে তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে ব্রেশ্‌ট কি নিজেই সেটা চান নি? তিনি যা চেয়েছিলেন ঠিক তাই ঘটেছে, অর্থাৎ শ্রোতা বা দর্শক স্পষ্টতই দুভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে।' আউগুস্ট বেবেল বলেছিলেন: 'তোমাকে তোমার শত্রুরা যখন প্রশংসা করবে, মনে রেখো তোমার আচরণে নিশ্চয়ই কিছু অসংগতি রয়ে গিয়েছে।' আর এই উক্তিটিকে মানদণ্ডের মতো ধরে নিয়ে আমরা বলতে পারি, এই সমস্ত দেশ ব্রেশ্‌টের শত্রু নয়, বন্ধু, নিজের ভুল শুধরে-শুধরে যারা তাদের যথার্থ বন্ধুর অত্যন্ত কাছে চলে আসতে চাইছে। রুট টোমাসেনের এই নিরূপণ নিঃসন্দেহে ব্রেশ্‌ট-সমালোচনার ধারায় একটি প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শ তৈরি করতে পেরেছে।

পক্ষান্তরে, ইংল্যাণ্ডই একমাত্র দেশ যেখানে বেটোল্ট ব্রেশ্‌টকে খানিকটা প্রশ্রয়ী কৌতুকের চোখে দেখা হয়েছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত গোটা ইংলণ্ডে

ব্রেশ্‌ট মাত্র চারবার অভিনীত হয়েছেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কাগজপত্রে যে-দুটি নাটক মোটামুটি ভালো বলে স্বীকৃত হয়েছে, সে দুটি হলো মাদার কারেজ (Mutter Courage) এবং 'ককেশীয় খড়ির গণ্ডি' (Der Kaukasische Kreidekreis) সত্তরের গোড়ার দিক থেকেই তাঁকে একজন নাট্যকার বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তাও তাঁর রাজনৈতিক সত্তাকে খারিজ করে। তাঁকে বারবার একজন এণ্টারটেইনার-এর ভূমিকায় দেখতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেখানেও যে তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ সেটা বলতে অধিকাংশ সমালোচকের সামান্যতম কুণ্ঠা হয়নি। 'তিন পয়সার পালা'র (Dreigroshenoper) ১৯৩৫-এর অভিনয়ে Sunday Times লক্ষ্য করেছিল John Gay-র আদর্শে তৈরি অক্ষম প্যারডি! মন্তব্য করেছিল, ব্রুট ভাইল আর বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্ এই দুটো লোকই ক্লান্তিকর দুটো কুকুর যেন; এমন কি অপরাধ বা রোমাঞ্চকেও এরা দেখছি একঘেয়ে করে তোলে। ১৯৫৬-তে Caucasian Chalk Circle-এর অভিনয় দেখে New Statesman-এর মন্তব্য: দুঃসহ এই জর্মন একঘেয়েমির নাট্যকার—বোর্টোল্ট ব্রেশ্‌ট! ব্রেশ্‌টের নাটকে তথাকথিত এই Category of boredom নিয়ে একটি মেয়ে নালিশ তুলেছিল কেনেথ টাইনান-এর কাছে, বলেছিল 'এত মন্থর এই নাটক যে মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়।'

Kenneth Tynnan তাকে ব্রেশ্‌ট-এর মন্থরতার তাৎপর্য শুনিয়ে কী বলেছিলেন জানিনা, সেটা আমাদের বিশদ জানা নেই। কিন্তু এই উত্তরই ছিল স্বাভাবিক যে 'এই মন্থরতা তোমাকে জীবনের কাছেই নিয়ে আসে না'? ব্রেশ্‌ট নিজে এই দ্বৈপ মর্জির দেশে ততোটা ঝুঁকি নিতে চাননি। মৃত্যুর আগে ১৯৫৬-তে ইংল্যাণ্ডে তাঁর বের্লিনার আঁসাব্‌ল্ নিয়ে সফর করতে গিয়ে তিনি তাঁর নাট্যদলকে একটি পরামর্শই বারংবার দিয়েছেন V-effekt-এর দরকার নেই বাপু, এদের কাছে হয়ে ওঠো Schnell, leicht, kraftig, অর্থাৎ দ্রুত, হাল্‌কা আর জোরালো। কেনেথ টাইনান-এর মনে হয়েছে, এই পরামর্শ যতই বিচক্ষণ হোক না কেন, এর কোনো অভিঘাত তৈরি হয়নি অ্যাংলো-স্যাক্সন মানসে, মনে হয়েছে ইংরেজি নাটকে নয়, নাট্য পরিচালকদের মনে তিনি কিছু নিরীক্ষার সাহস জুগিয়েছিলেন। আর তাই ব্রেশ্‌টকে আরো আকর্ষণীয়, নাকি হাস্যাস্পদ, করার জন্য গ্লাসগোর Citizen

ওপরের ছবি : ১৯৪৯-এ বার্লিনের ডয়েচেস থিয়েটারে "মাদার কারেজ" নাটকের ব্রেশ্‌ট অনুমোদিত অভিনয়ে মাদার কারেজের ভূমিকায় তার সহধর্মিণী বিপ্লবী অভিনেত্রী হেলেন ভাইগেল।

নিচের ছবি : ১৯৭০-এ গ্লাসগোর Citizens Theatre-এর প্রযোজনায় মাদার কারেজ একটি ভাঙা লরি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

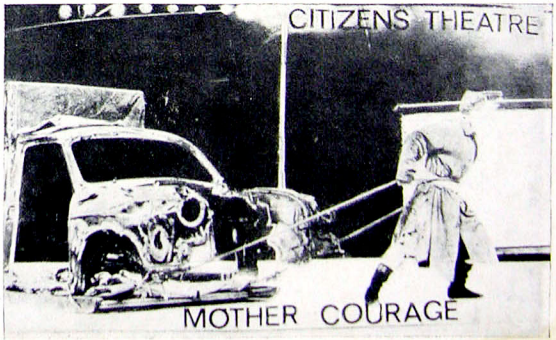

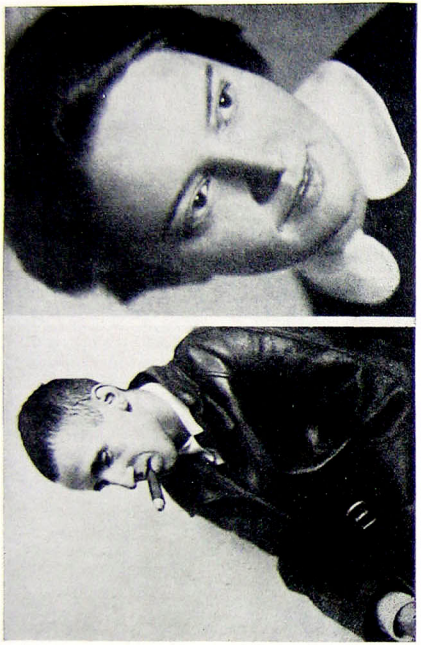

"তিন পয়সার পালা" (Three Penny Opera) রচনা মুহূর্তে ব্রেশ্‌ট।

ব্রেশ্‌টের সহকারী এলিজাবেথ হাউপ্টমান, Gay's Beggar's Opera-র অনুবাদিকা, যিনি অপরাপর ইংরাজি সাহিত্যকারের সঙ্গে ব্রেশ্‌টের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন।

Theater-এর প্রয়োজনায় এমন-কি মাদার কারেজকে একটি ভাঙা লরি নিয়ে টানতে দেখা গেছে। (সঙ্গের মুদ্রিত ছবিগুলি দ্রষ্টব্য)

তা থেকে নিশ্চয়ই নাট্যকারের অক্ষমতা প্রমাণ হয়না, প্রমাণিত হয় ইয়োরোপের একটি বিশেষ দেশের স্থানীয় মেজাজ বা মর্জির বিশেষ ধরণ, যা ব্রেশ্‌টের শিল্প বা সমালোচনার মূল প্রবণতাগুলি আদৌ ধরতে পারেনি, অথবা নিজের স্বভাবের রূপান্তরের আশঙ্কায় এই অনুধাবনে আদৌ সাড়া দেয়নি।

আমরা যদি প্রচলিত পূর্বসংস্কারবশে ধরেই নিই যে, সোভিয়েট রাশিয়া গোড়া থেকেই ব্রেশ্‌টকে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল, তাহলে ভুল করবো। এটা বললেই হয়তো ঠিক হবে যে, রুশ চরিতমানস প্রথমে চায়নি তার চৈতন্যের দিগন্তকে প্রসারিত করতে। ব্রেশ্‌টীয় নাট্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে যেমন তার দেরি হয়েছে, ঠিক তেমনি নিজস্ব ব্রেশ্‌টীয় ঐতিহ্য তৈরি করে নিতে গিয়েও। ভাবতে গেলে অবাক লাগে, ১৯৩০-এর জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১৯৭২-এ নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র রাশিয়ার থিয়েটার, রেডিও ও টেলিভিশনে সবসুদ্ধ মাত্র একশো'বার ব্রেশ্‌টের নাটক পরিবেশিত হয়েছে। এরই পাশাপাশি, ১৯২৩ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ব্রেশ্‌টের কৃতি ও উত্তরাধিকার নিয়ে ২৯৪টি দীর্ঘায়ত আলোচনা; বই ও প্রবন্ধ মিশিয়েই বলছি। এই পরিসংখ্যানটি আপাতত হয়তো তেমন-কিছুই বলে না। কিন্তু এই রচনাগুলি যে অভিনিবেশ ও একাগ্রতা নিয়ে লেখা হয়েছে, অন্য ভাষায় আশ্রিত ব্রেশ্‌টীয় সাহিত্যে গবেষণায় তার জুড়ি মেলে না। কালক্রমিক বিবর্তনের মাপকাঠি দিয়ে দেখলে রীতিমতো চোখে পড়ে প্রাথমিক সতর্কতার পাশে পরবর্তী স্বীকৃতির উষ্ণতা। আর তার ফলে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না স্বীকরণের এই ঐতিহ্য প্রধানত দীর্ঘ বিবেচনা ও পর্যালোচনার উপহার। ১৯৫৭ অর্থাৎ আমাদের নাট্যকারের মৃত্যুর পরের বছরটিকে এই পরিগ্রহণের ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন বলতে হবে। এই বছরেই আঁসাব্‌ল্‌ প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে তার অভিনয় দেখায়। এই অভিনয় কোনো সমালোচকেরই পছন্দ হয়নি, তাঁরা সবাই একবাক্যে রায় দিয়েছেন, 'অন্য গ্রহ থেকে যেন নেমে এসেছে একটি নাট্যদল, পুরো ব্যাপারটাই বিদেশী।' ১৯৬৮-র নভেম্বরে আঁসাব্‌ল্‌ যখন আবার এল, তার ভিতরে সোভিয়েট-স্বভাব ব্রেশ্‌টের সঙ্গে একটি নিজস্ব বোঝাপড়ার ধরন তৈরি করে নিয়েছে। আর তাই 'আর্তুরো উই'-এর অভিনয় দেখতে মজুর অথবা অধ্যাপক পঞ্চাশ রুব্‌ল্‌ পর্যন্ত খরচ করেছে প্রবেশপত্র পাবার জন্য। ঐ এক

দশকের মধ্যে রাশিয়া আবিষ্কার করেছে এমন একজন ব্রেশ্‌টকে যিনি শুধু প্রোপ্যাগাণ্ডাধর্মীই নন, একজন মহৎ শিল্পী যিনি একজন শিক্ষকও বটে। এই অভিনয় মুহূর্তেই, মস্কোর স্তানিশ্‌লাভ্‌স্কি থিয়েটারেই শুধু নয়, গোটা রাশিয়ার ২১টি মঞ্চ জুড়ে অভিনীত হয়েছে 'তিনপয়সার পালা', সমালোচক য়ুরিখ বোরেভ-এর একটি ঐতিহাসিক নির্ধারণের সত্যতা পরখ করবার জন্য। 'ব্রেশ্‌ট একাধারে ক্লাসিসিস্ট এবং সামাজিক বাস্তবতার রূপকার'—বোরেভ-এর এই উক্তিটির যাথার্থ্য এভাবেই প্রযুক্তির সাহায্যে যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। ব্রেশ্‌টকে কি আদৌ চিত্তবিনোদক বলা যায়? এই প্রশ্নের নিরসন করতে গিয়ে আঁসাব্‌ল প্রযোজিত 'মানুষ তো মানুষই' ('Mann ist Mann')নাটকটি রাশিয়া সম্পূর্ণই বর্জন করেছে,কেননা সমালোচকদের কাছে মনে হয়েছে, ভালো অভিনয় দিয়েও এই নাটকটিকে 'চিরায়ত' বলে চিহ্নিত করা যাবে না, কেননা এর মধ্যে নেই সময়োচিত প্রাসঙ্গিকতা। পক্ষান্তরে একই সূত্রে মস্কোর আর্ট থিয়েটারের ছাত্রেরা ব্রেশ্‌টের একাঙ্কিকা 'খুদে মানুষের বিয়ে' (Die Kleinbürgrhochzeit) অভিনয় করে হেলেনে ভাইগেলকে মুগ্ধ করেছে। এখানে ব্রেশ্‌ট কম কথা বলেছেন, শ্রোতাকে খুশি করেছেন এবং তা সত্ত্বেও এখানে সময়োপযোগী প্রসঙ্গমূল্য আছে—এটিই ছিল এই অভিনয়ের এষণা। মনে রাখতে হবে, তখন পর্যন্ত পুব বা পশ্চিম জার্মানিতে কোথাও এই একাঙ্কটি অভিনীত হয়নি একবারও।

মস্কোর পাশাপাশি লেনিনগ্রাদে ব্রেশ্‌টের প্রাসঙ্গিকতা এই বছর বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল। আতুরো সেই নাটক যার অভিঘাত লেনিনগ্রাদে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। তার একটা বড়ো কারণ, হিটলারের পরিচালিত যুদ্ধে নিহত অন্তত আশি হাজার মানুষের সমাধি এই শহরের বুকে একটি অনপনেয় স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু নিছক সমবেদনাই নাটকটির মুগ্ধ সমালোচনার পিছনে সক্রিয় ছিল না। এখানকার নাট্যপরিচালক জে. পি. ভ্যাদিমিরভ প্রসঙ্গত বলেছেন, 'আতুরো উই'র এই রূপায়ণ আমাদের ভালো লেগেছে, যদিও রুশ থিয়েটারের প্রথানুগত ঐতিহ্যের সঙ্গে এর কোথাও কোনো মিল নেই। আমাদের এই ভালোলাগার প্রধান কারণ, রূপকল্প আশ্চর্যভাবে এর ভাববস্তুর সঙ্গে মিলতে পেরেছে, আমার ধারণা, আমাদের নাটকে উন্নত রূপকল্পকে আমরা ততটা মূল্য দিইনি, এ পর্যন্ত, জোর দিয়ে এসেছি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশেষত্বগুলির উপর। আর সেই কারণেই রুশ থিয়েটারের কোনো 'স্কুল'-এর পক্ষে ব্রেশ্‌টের অভিনয় সহজ ব্যাপার নয়। তাঁর

প্রতিটি নাটকেই নির্মিতির নতুন-নতুন প্যাটার্ন উঠে আসে এবং সেটাই তাঁর কাছে আমাদের শিক্ষণীয়।'

শুধু নির্মিতি নয়, মূল নাটকের প্রকল্পের কাছেও সৎ থাকতে হবে, ভ্যাদিমিরভ্‌ এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। লেনিনগ্রাদে তাই 'পুন্টিলা'ই হোক বা 'তিনপয়সার পালা'ই হোক প্রত্যেকটি নাটকই অনেকগুলি অনুবাদের মাধ্যমে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। তা থেকে আবারও প্রমাণ হয়, এই ব্রেশ্‌ট-চর্চা মনন ও চিন্তনের দ্বারা উদ্দীপিত, যদিও ব্রেশ্‌ট-নির্দেশিত ব্যবধান-অভিঘাতকে সেখানে ততটা আমল দেওয়া হয়নি।

রাশিয়ায় বের্লিনার আঁসাব্‌ল্‌কে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীমতী ফুরৎসেভা একটি কথা অত্যন্ত নম্র ভঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, এটি শুধুমাত্র একটি নান্দনিক ঘটনা নয়, 'একটি রাজনৈতিক ঘটনাও বটে।' তার অর্থই এই যে, রাশিয়া ব্রেশ্‌টকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে নি। পূর্বাঞ্চলের অন্য আরেকটি দেশ, রুমানিয়া, এই নান্দনিক-রাজনৈতিক মানদণ্ডের দোলাচলে দ্বিধান্বিত হতে রাজি নয়। সরাসরি বলা ভালো, ব্রেশ্‌টের কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য রুমানিয়া মেনে নেয় নি। তাই জর্মন সাহিত্যের ইতিহাসের 'ঝড়-ঝাপ্টার যুগ' (Sturm und Drang)-এর য়্যুশ্‌নার ও আমাদের যুগের ব্রেশ্‌ট একই মঞ্চে একই কারণে অভিনীত হয় এখানে। কারণটি হল, ব্রেশ্‌ট নাকি শুধুমাত্রই ধ্রুপদী, আমাদের, যুগমুহূর্তের সঙ্গে এই নাট্যকারের তেমন কোনো সংশ্রব নেই। গত উনত্রিশ বছর ধরে এখানে যে 'নতুন সাহিত্য' আন্দোলন চলছে তার প্রতিভূ হোভিয়াক সম্প্রতি স্পষ্টতই জানিয়েছেন, ভালোই হয়েছে ধ্রুপদী সাহিত্যের বিচ্ছিন্ন মহলায় ব্রেশ্‌ট আশ্রয় নিয়েছেন; তা নইলে নিজের মূর্তির অসংখ্য অনুকরণের কাছে তাঁকে আজ বারবার পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে হত। কথাটা নিদারুণ ব্যঙ্গোক্তি, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পর্যালোচনায় সমালোচক যে-বৈঠকী শৌখিন মার্কসবাদ সম্পর্কে ঈষৎ কঠোর হতে পেরেছেন, সেই মনোভঙ্গিটিও ব্রেশ্‌টের কাছ থেকেই অর্জিত। শহরাঞ্চল বুলগেরিয়াতেও সামাজিক রোমান্টিকতা নামক একটি অলীক মানদণ্ডে ব্রেশ্‌টকে দেখার চাহিদা একই মানসবৃত্তির রূপভেদ।

আমাদের এই প্রতিবেদনের মধ্যে, আমার ধারণা, পশ্চিম ও পুব জর্মনিতে ব্রেশ্‌টের মূল্যায়নের কোনো-কোনো সূত্র আভাসিত হয়ে উঠেছে। তবুও আরো কয়েকটি সংবাদ এখানে অবান্তর হবে না। পশ্চিম জর্মনিতে ব্রেশ্‌ট আজ এক

দ্বিধাবিভক্ত মনোভঙ্গির শিকার। এই মুহূর্তের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক পেটার হাণ্টকে যদিও ব্রেশ্‌টকে না-চিরায়ত না—সমকালীন নাট্যকার হিসেবে গণ্য অথবা নগণ্য বলে মনে করেন। তবু ব্রেশ্‌টের লেখা বই নয়, তাঁকে নিয়ে লেখা জীবনীধর্মী আলেখ্যের কাটতি এখানেই বুঝি সবচেয়ে বেশি। উল্লেখযোগ্য, এই পর্যায়ের পেঙ্গুইনপ্রতিম ROWOHLT প্রকাশনের প্রকাশিত বইয়ের বিক্রির হিসেব অনুযায়ী, প্রায় তিন লক্ষ সংখ্যা নিয়ে ব্রেশ্‌টের-এর উপর লেখা জীবনী তালিকার চূড়োয়। তাঁর অনেক পর, ক্রমান্বয়ে কাফ্‌কা, কাম্যু, হেরমান হেসে, রুডল্‌ফ স্টাইনার, টোমাস মান, কার্ল মার্কস, শিলার, ভোল্‌ফগাং বোর্শেট, সবশেষে, মাত্র এগারো হাজার বিক্রয়সংখ্যা নিয়ে ম্রিয়মাণ বিশ্ববরেণ্য ধ্রুপদী শিল্পী, য়োহান ভোল্‌ফ গাংঃফন গ্যোয়েটে। কিন্তু এই শীর্ষসফলতা একটি প্রতারক ব্যাপার। এর মূলে স্থানীয় পাঠকের 'অবৈধ' কৌতূহল যতখানি, অনিবার্যতা নিশ্চয়ই ততটাই উচ্চারিত নয়।

এবং সেইসঙ্গে স্বীকার্য, 'অবৈধ' নাট্যকার হিসেবেই তাঁর জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে বেড়ে গিয়েছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত নিষিদ্ধ নাট্যকারদের তালিকায় অগ্রণী নাম বের্ট্রোল্ট ব্রেশ্‌ট, বিশেষত 'খড়ির গণ্ডি' এবং 'গ্যালিলিও' নাটকের শুধু মঞ্চায়ন নয়, মহড়াও এখানেও যেন নিষিদ্ধ হয়, সেই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালিয়েছিল। স্বয়ং ব্রেশ্‌টের জন্মশহর Augsburg-এ এই আয়োজন ১৯৭৩-এ ব্রেশ্‌টের পঁচাত্তর বছরের জন্মদিনে Christian Socialist Union-এর প্রণোদনায়, এতদূর সফল হয়েছিল যে, Ausburg-এর রাষ্ট্রীয় মঞ্চেও সেদিন ব্রেশ্‌ট অনুষ্ঠিত হতে পারেন নি।

শুধু পশ্চিমের কোনো-কোনো অঞ্চলের প্রভাবশালী কর্তৃসংস্থাকে দায়ী করলে চলবে না, পুব জর্মনির দিক থেকেও, বিশেষত হেলেনে ভাইগেলের মৃত্যুর পর ব্রেশ্‌টের সন্ততিবর্গের পক্ষ থেকে একচেটিয়া স্বত্বাধিকারবোধ পশ্চিমের প্রয়োজনার উপর একধরনের চাপ তৈরি করে চলেছে। ব্রেশ্‌টের কন্যা বারবারার উপর নির্ভর করছে, অন্যান্য জর্মনভাষাভাষী দেশে ব্রেশ্‌টের কোন্ নাটক অভিনীত হতে পারবে, এবং হলে কোন্ অভিনেতৃবর্গ তাতে অংশ নেবেন। শুধু পশ্চিম জর্মানিতে নয়, পুবেও ব্রেশ্‌টকে নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা গত বছর থেকেই মানফ্রেড হ্বেকভের্থ বের্লিনার আঁসাব্‌ল্-এর ভার নেওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা এত দূরই গড়িয়েছে যে, ভিয়েনা-র বিখ্যাত বুর্গ

থিয়েটার শেষ পর্যন্ত পুব বার্লিনের সাম্প্রতিক নাট্যউৎসবে অংশ নিতে পারে নি। ভিয়েনা তার ব্রেশ্‌ট-ভাষ্য নিয়ে আমন্ত্রিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ভিয়েনা-র প্রধানতম এই নাট্যদলের পরিচালক বেনিস্ যখন 'শহুরে জঙ্গলে' 'জননী' ও 'পুন্টিলা'-র অতিথি-অভিনয় দাবি করেন, ব্রেশ্‌ট-সংস্থার শুদ্ধতার আতিশয্যে সেই আমন্ত্রণ বাতিল হয়ে যায়। বারবারার বাসনা এরকম নয়, যে 'এই নাট্যকারকে নিয়ে রুথ বের্গহাউস যে-রকম করেছেন, সেই ধরনের বৈপ্লবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকুক। ১৯৭৬-এর আগস্টে 'নতুন জর্মনি' পত্রিকায় হ্বেকভের্থ লিখে বসেছিলেন: 'ব্রেশ্‌ট নিজেই আমার কাছে আজ তাঁকে অভিনয় করে ওঠার পক্ষে কঠিনতম সমস্যা। ঘুরিয়ে বলতে গেলে, তাঁর মূল সূত্রগুলির কথা মনে না রেখে প্রত্যেকেই আজ নিজের-নিজের ধারণা ব্রেশ্‌টের নাটকের উপর আরোপ করছে'। আঁসাবল্-এর পরিচালক হবার পর থেকে তিনি তাই তাঁর একটি কর্তব্য হিশেবে স্থির করে নিয়েছেন ব্রেশ্‌টের নাটক অভিনীত হোক বা না হোক, তাঁর ও ব্রেশ্‌ট-দুহিতা বারবারা-র পূর্বার্ধ ব্রেশ্‌টীয় ক্যাটিগরি থেকে বিচ্যুত হলে ব্রেশ্‌ট অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হবেনা কাউকেই। তাই ব্রেশ্‌টের আশি বছরের জন্মদিনে বার্লিনার আঁসাব্‌ল্ ছাড়া আরকোনো নাট্যসংস্থাকেই ব্রেশ্‌টের নতুন প্রযোজনার অনুমতি দেয়া হয় নি। পুব লোকমঞ্চ বা Volksbühne-র পরিচালক 'কম্যুনের দিনগুলি' (Tage der Kommune) মঞ্চস্থ করার অনুমতি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বেতার মাধ্যমের দ্বিতীয় দরোজা ধরে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, তাঁকে নিয়ে পুব জর্মনির হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি সেমিনার এই উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছে; প্রথমটির বিষয়, 'সামাজিক বাস্তবতা ও ব্রেশ্‌ট'; দ্বিতীয়টির উপপাদ্য—ব্রেশ্‌টের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অগ্রণী দেশগুলির উপর। পুব জর্মনি থেকে সদ্যপ্রকাশিত জার্নাল Notate-র লক্ষ্যমাত্রাও এই অক্ষরেখায় সক্রিয়।

রুথ বের্গহাউস—যাঁর ওপর মূল ব্রেশ্‌টের ওপরে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা আরোপিত হচ্ছে—কী করেছিলেন? তিনি 'কোরিওলানে'র প্রযোজনায় যুদ্ধের কিছু নতুন কোরিওগ্রাফি জুড়ে দিয়েছিলেন, এটাই তাঁর অপরাধ? এই কারণেই, পশ্চিম জর্মনির প্রধান ব্রেশ্‌ট-সমালোচকদের তরফ থেকে, পুব জর্মনির বের্লিনার আঁসাব্‌ল্-এর উপর আজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অমোঘ এই অভিযোগ যে, ব্রেশ্‌টকে এঁরা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে গিয়ে তাঁকে জনৈক

ক্লাসিসিস্ট-এ পরিগণিত করেছেন। মজার ব্যাপারটা এই যে, 'ধ্রুপদী' শব্দটি এখানে নিতান্ত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এবং, সংগতভাবেই পুবের দিক থেকেও পশ্চিমের ওপর অনবরত আরোপিত হচ্ছে : ব্রেশ্‌টকে 'চিরায়ত'হিসেবে সংকীর্ণ করে দেখার অভিযোগ। এই অভিযোগ বহুলাংশে সত্যি। ১৯৫৮ সালে হাইডেলবার্গের অধ্যাপক অটো মান, তাঁর 'মানদণ্ড নাকি পুরাণ' বইতে স্পষ্টই কবুল করেছেন : 'পশ্চিমে ব্রেশ্‌টকে প্রধানত দেখানো হয় কবিরূপে, এবং তারপর কচিৎ হয়তো মার্কসবাদী হিশেবে। আমি আমার আলোচনার প্রথমে ব্রেশ্‌টের মার্কসবাদী সত্তা এবং অতঃপর তাঁর কবিসত্তার উপর জোর দেব।' এখানেও আমরা দেখছি ব্রেশ্‌টের মার্কসবাদী ও শিল্পীসত্তার মধ্যে কৃত্রিম অর্থাৎ ভুল বিভাজন। এবং পুব জর্মনির এই অবলোকন মিথ্যা নয়, মার্কসবাদী ও শিল্পী ব্রেশ্‌টের তথাকথিত দোটানা মেটাতে না পেরে পশ্চিম জার্মান আজ তাঁকে নিরপেক্ষ ক্লাসিসিজম-এর শিবিরে ভুক্ত করে এই মর্মে নিশ্চিন্ত আছে যে, ধ্রুপদী শিল্পীর যেন কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে না।

আমাদের এই প্রতিবেদনের শেষে, ব্রেশ্‌টের একটি নাটকের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। নাটকটির নাম 'খড়ির গণ্ডি'। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, এমন-কি যেখানে অন্য কোনো নাট্যকারের নাম তেমন মমতার সঙ্গে বিবেচিত হয় নি, ব্রেশ্‌টের এই নাটক—সম্ভবত এই নাটকটিই—সব চেয়ে বেশি অভিনীত। শুধুমাত্র জর্মনভাষাভাষী দেশপুঞ্জ এবং হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাতেই, ১৯৪৫-৭৫ এই পর্বে এই নাটকের, প্রথম অভিনয়রাত্রির নিরিখে, পরিসংখ্যা ৬১। আর প্রধানত নাটকটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপ্ত গবেষণা-সন্দর্ভের সংখ্যা ২৩ এবং ৩০৫টি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এক লহমায় দুই-তিনটি দেশে এই নাটকের প্রবর্তনা ও প্রযোজনার মূল প্রবণতা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করব।

ব্রেশ্‌টের তৈরি নাটকের খসড়ায় ১ পারসিক শাহ্‌নামা থেকে শুরু করে এপ্‌স্টাইনের ম্যাডোনা ও শিশু খৃস্টের প্রতিকৃতি ও যুদ্ধবিপর্যয় ফিনল্যাণ্ডের আলোকচিত্র লক্ষ করা যাবে। নানাসময়ের নানারকম চিরায়ত মোটিফ ব্রেশ্‌ট জড়ো করেতে করতে-করতে মধ্যযুগীয়তা থেকে দৈনন্দিনে নেমেছেন এবং এই ছবিগুলি দেখতে-দেখতে দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগিবে, ব্রেশ্‌ট কি চিরদিনের, নাকি, আজকের? ন্যান্সি ওয়েবার যিনি নাটকটি নিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও তথ্যসহ কাজ করেছেন। একটি জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন : ব্রেশ্‌টের এই শ্রেষ্ঠ কাজ,—তাঁর মার্কিনী নির্বাসনের উপহার—তাঁর অন্যান্য নাট্যকর্মের তুলনায়

উদ্দেশ্যহীন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ; ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে, এই নাটকটিয় মধ্যেই সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক-সামাজিক নিহিতার্থ সঞ্চিত হয়ে আছে।

ওয়েবার-এর অনুমিত এই ভবিষ্যৎ এখনই সূচিত হয়ে গিয়েছে। পোর্তুগালের গোষ্ঠী ৪. ব্রেশ্‌টের এই নাটকের অভিনয় মুক্ত-মঞ্চ বা Teatro Aberto-তে গত কয়েক বছর থেকে অভিনীত করে চলেছেন। পশ্চিম জর্মনির ব্রেশ্‌টীয় এস্টাব্লিশ্‌-মেন্টের অন্যতম প্রতিনিধি সমালোচক বেনিয়ামিন হেনরিখ্‌স্‌-এর বিখ্যাত 'Brecht ist passe'-এ, অর্থাৎ 'ব্রেশ্‌টের পালা খতম' এই থিসিসের প্রতিবাদেই গড়ে উঠেছে এই নাট্যসংস্থা। এই সূত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, পোর্তুগালের সেন্সরের ইতিহাস কয়েকশো বছরের। পোর্তুগালে ব্রেশ্‌টের অভিনয় তাই আজও এক অবিজিত পৌরুষের ব্যঞ্জনা। লিসবনে এই নাটকের সাম্প্রতিক অভিনয়গুলির নথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি এই নাটকটিকে, তার আপাত পৌরাণিক ও রূপকথাময় পরিবেশের দরুন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ খারিজ করে দিতে পারছেন না। ব্রেশ্‌টের রূপক তাই পোর্তুগালে আজ হয়ে উঠেছে অব্যবহিত সংগ্রামের উপলক্ষ। নাটকের উপকথা একটি অপরূপ প্রচ্ছদের মতো কাজ করছে। এর শেষ দৃশ্যে মূল অভিনেতা যখন 'মাটি তার, মদৎ যার' গানটি শোনায়, শুরু হয়ে যায় কাহিনীর চিরায়ত আচ্ছাদনের ভিতর থেকে জাগ্রত তার তীব্র নাটকীয় প্রাসঙ্গিকতা। প্রতিটি অভিনয়ের শেষেই, এই নাটকের ভাবানুষঙ্গে, অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে আলোচনাচক্র শুরু হয়—কোন্‌ মা বড়ো? যে জন্ম দিয়েছে, সেই মা, নাকি যে লালন-পালন করেছে? এই উপমা শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত হতে থাকে, এবং পোর্তুগীজ কৃষিপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে জমে ওঠে তর্কবিতর্ক : জমি কার, খেটে-খাওয়া চাষীর, নাকি তথাকথিত মালিকের? ভারতীয় ভাষায় একই নাটক অনুবাদ করতে গিয়ে কমলেশ্বরের দ্বিধা তখন মনে আসে। অনুবাদককে প্রেরণা দিয়েছে অবাস্তব তথা অ্যাবসার্ড এই ঘটনা : 'মনে পড়ে সেই ইতিহাসমুহূর্ত যখন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আসছে। তাদের তিলধারণ আর ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেকটি পয়সার যখন মূল্য আকাশচুম্বী, তখন মস্কোতে ভারতের মহিলা রাজদূত নিজের ঘর সাজাবার জন্য লাখ লাখ টাকার আসবাবপত্র, ভারতবর্ষ থেকে নয়, ভারতের একদা-মালিক ইংল্যাণ্ড থেকে আনাচ্ছেন, এবং ইরান থেকে, কেননা রুশি কার্পেট তাঁর তত পছন্দ নয়।'

আমাদের আরো তিনজন নাট্যকার, বাদল সরকার, রুদ্রপ্রসাদ এবং সুব্রত

নন্দী-র 'গণ্ডি', 'খড়ির গণ্ডি' এবং 'খড়ি মাটির' গণ্ডি'-র প্রয়োজনাতেও এই ধরনেরই উদ্দীপন-বিভাব কমবেশি মূর্ত হয়ে আছে, এরকম ভাবনা উপেক্ষণীয় নয়। বাদল সরকার যে তাঁর ছায়াভাষ্যে ওই নাটকের প্রস্তাবনা-অংশ বাতিল করে দিয়েছেন, সেটা কি নাটকটির রুশ প্রযোজকদের বিখ্যাত অনুযোগের সমর্থনে যে, দেশকালের আয়তনের সঙ্গে সেটি মিলছে না? আর রুদ্রপ্রসাদ যখন তাকে চূড়ান্ত অব্যবহিত সাম্প্রতিকের দিকে নামিয়ে আনছেন, তখন 'খড়ির গণ্ডি'র চিরায়ত-প্রাত্যহ দোলাচলখচিত ভারসাম্যকেই অগ্রাহ্য করে হয়তো। মূলের অনেকখানি কাছাকাছি থেকে গিয়েছেন তৃতীয়োক্ত নাট্যকার কি কালী দাশগুপ্তর অব্যর্থ সুরসংযোজনের সহায়তায়, ব্রেশ্‌টের কালোত্তরণের দিকে ঝুঁকে থাকবার গরজেই?

এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা এখনি হয়তো মিলবেনা। ব্রেশ্‌টের নন্দিত ও নিন্দিত ক্লাসিসিজমের সৌজন্যে ভবিষ্যতের নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। ১৯৭৪-এ পূর্ব বার্লিনের নাট্যোৎসবে বিজয়া মেহ্‌তা ও ব্রিৎস বেনেভিৎসে যুগ্ম পরিচালনায় এই নাটক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই মর্মেই নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। যারা এ নাটক করছে তাদের উপার্জনের উৎস থিয়েটার নয়, অন্যত্র, এই কথাটা মনে রেখেও সমালোচকেরা সেদিন আচম্‌কা এরকম প্রশ্ন তুলেছিলেন ধনী/নির্ধন মানুষের মধ্যে, বন্যা এবং খরার প্রতিরোধকল্পে একটি বাঁধ তৈরি নিয়ে শুরু হয়ে যায় খাওয়াখাওয়ি, ওরি মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে, কেনই বা উঠে এল ভগবানের ভূতে পাওয়া মহাজন, কেন সে বলে উঠল, একটি নাটক যদি দেখানো যায় তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, যে-জমিতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সেটি কার?

ব্রেশ্‌ট তাঁর শেষ পর্বের 'থিয়েটার' শীর্ষক একটি কবিতায় বলেছেন: আলোর উঠে আসা/দুঃখের জন্য উন্মুখ মানুষেরা, আর খুশি-হওয়া আরো কয়েকজন-/ আর তারাও যারা পরিবর্তিত হবার জন্য প্রতীক্ষমাণ।' ওই প্রতীক্ষার যুগদেহলিতে পশ্চিম আর পুবের মানুষ আজ ব্রেশ্‌টকে উদ্‌ঘাটন করতে চাইছে। এরিক বেন্টলি, যেন ইয়েট্‌সের সেই পরিত্যক্ত ধরনেই, পুবের আশাবাদ আর পশ্চিমের নিয়তিনির্জিত প্রবণতার আলোয় তাঁকে গ্রহণ করার পথে একটি স্পষ্ট ভেদরেখা দেখতে পেয়েছেন।' এমন ভরসা হয়তো-বা অসংগত নয়, একদিন, তথাকথিত এই তৃতীয় বিশ্বে আমাদের চেতনার রূপান্তর ঘটলেই, সম্পূর্ণ পরিগৃহীত হবেন দিনবদলের এই কবি।

বিদেশী সাহিত্য

Memoirs

Pablo Neruda

[সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য-ইতিহাসে পাবলো নেরুদার 'জীবনস্মৃতিপঞ্জীর' প্রকাশ এক অসামান্য ঘটনা। মানুষের জীবনে এমন সৎ, পবিত্র, অনিন্দ্যসুন্দর রচনাপাঠের সৌভাগ্য খুব বেশী আসে না। বইটি কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে এসেছে। নেরুদার ঘটনাবহুল জীবনের এক স্মরণীয় অংশ স্পেনের আরো এক বিখ্যাত কবি ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু ফেদারিকো গার্থিয়া লোরকার স্মৃতি। নিচের প্রকাশিত অংশ দুটিতে নেরুদা তার নিজের এবং লোরকার জীবনের কিছু নতুন আকর্ষণীয় তথ্য পাঠককে জানিয়েছেন। মূল স্প্যানীশ থেকে ইংরাজীতে সুন্দর অনুবাদ করেছেন Hardie St. Martin। অনেকের ধারণা প্রথম অংশে বর্ণিত "ethereal lady poet"টি নাকি পরবর্তীকালে একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রঅনুরাগিণী হিসাবে খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। সঙ্গত কারণেই নামটি উহ্য রাখা হলো। —সম্পাদক]

WHAT FEDERICO WAS LIKE

A long sea voyage of two months brought me back to Chile in 1932. There I published *El hondero entusiasta*, which had been mislaid among my papers, and *Residencia en la tierra*, which I had written in the Orient. In 1933 I was appointed consul of Chile in Buenos Aires, and there I arrived the month of August.

Federico Garci'a Lorca arrived in that city almost at the same time, to direct his tragedy *Blood Wedding*, performed by Lola Membrive's troupe. We hadn't known each other, but we met in Buenos Aires and were often feted together by writers and friends. Of course, we had our share of incidents. Federico

had his detractors. So did I, and I still have them. These detractors are driven by a desire to snuff out the lights, to keep us from being seen. That's what happened this time. Because there was a lot of interest in attending the banquet the P.E.N. club was holding for Federico and me at the Plaza Hotel, someone kept the phones busy all day long spreading the word that the dinner in our honour had been called off. They were so persistent that they even called the hotel manager, the telephone operators, and the chef to make sure no reservations were accepted and no dinner was prepared. But the maneuver fell through and in the end Federico Garci'a Lorca I got together with a hundred Argentine writers.

We camp up with a big surprise. We had prepared a talk *al alimo´n*. You probably don't know what that means, and neither did I. Federico, who always had some invention or idea up his sleeve, explained : "Two bullfighters can fight the same bull at the same time, using only one cape between them. This is one of the most perilous feats in bullfighting. That's why it is so seldom seen. Not more than twice or three times in a century, and it can be done only by two bullfighters who are brothers, or at least blood relations. This is called fighting a bull *al alimon*. And that's the way we'll do our talk."

And that is what we did. But no one knew about it beforehand. When we got up to thank the president of the P.E.N. club for honouring us with the banqnet, we did it together, like two bull fighters, to make our single speech. The diners sat at small, separate tables, and Federico was at one end of the room, I at the other. People on my side tugged at my jacket to make me sit down, believing there was a mix-up, and the same thing happened to Federico on the otherside of the room. Well, we set out speaking together, with me saying "Ladies" and he continuing with "and gentlemen", twining our phrases throughout, so that they flowed like a single speech, right to the end. The oration was dedicated to Rube'n Dari'o, because, though no one could accuse us of being modernists, both Garci'a Lorca snd I regarded Rube'n Daric as one of the most creative poets in the Spanish language.

Here is the text of the speech :

Neruda : Ladies . . . .

Lorca : . . . and gentlemen : In bullfighting there is what is known as "bullfighting *al alimo´n*," in which two toreros, holding one cape between them, outwit the bull together.

Neruda ; Linked as if by an electrical impulse, Federico and I will together thank you for this prestigious reception.

Lorca : At these gatherings it is customary for a poet to bring forth his living word, be it of silver or wood, and hail his companions and friends with his own voice.

Neruda : We, however, are going to seat a dead man among you, to bring you a table companion who is widowed, obscured by the darkness of a death greater than other deaths, widowed of life, whose dazzling spouse he was, in his shining hour. We shall stand in his fiery shadow, we shall cut out his name until his powers leap back from oblivion.

Lorca : First, a symbolic embrace, with our pengiun-like tenderness, to that exquisite poet, Amado Villar. Then we offer a great name upon the festal board, in the knowledge that wine-glasses will shatter, forks fly in search of the eye they hunger for, and a tidal wave stain the table linen. We give you the poet of America and Spain : Rube'n . . .

Neruda : Dari'o. Because, ladies . . .

Lorca : and gentlemen . . .

Neruda : Where, in Buenos Aires, is there a Rube'n Dari'o Plaza ?

Lorca : Where is Rube'n Dari'o's statue ?

Neruda : He loved parks. Where is Rube'n Dari'o Park ?

Lorca : What florist carries Rube'n Dari'o roses ?

Neruda : Where are Rube'n Dari'o apple trees ? Rube'n Dari'o apples ?

Lorca : Where is the cast of Rube'n Dari'o's hand ?

Neruda : Where ?

Lorca : Rube'n Dari'o sleeps in the Nicaragua of his birth under a ghastly lion made of plaster like those the rich set at their gates.

Neruda : A mail-order lion for him who was a founder of lions, a lion without stars for him who dedicatad the stars to others.

Lorca : In an adjective he gave us the sounds of the forest. Like Fray Luis de Granada, a master of words, he created constellations with the lemon, and the stage's foot, and mollusks filled with terror and infinity : he sent us to sea with frigates and shadows in the pupils of our eyes, and he built a limitless esplanade of gin across the grayest afternoon the sky has ever known, and he talked to the south wind in familiar terms, all heart, like the romantic poet he was, and his hand rested on the Corinthian capital, skeptical about all the ages, ironic and sorrowing.

Neruda : His luminous name should be remembered in its every essence, with the terrible griefs of his heart, his incandescent incertitude, his descent into the deepest circles of hell, his rise to the castles of fame, his greatness as a poet, then and forever and unequaled.

Lorca : As a Spanish poet, he was teacher in Spain to the older masters as well as to the children, with a sense of universality and a generosity present-day poets do not possess. He was teacher to Valle-Incla'n and Juan Ramo'n Jime'nez and the Machado brothers, and his voice was water and nitrate in the furrows of our time-honored language. From Rodrigo Caro to the Argensolas and Don Juan del Arguijo, the Spanish language had not such a festival of words, such clashing of consonants, such fire and such form as in Rube'n Dari'o. From Vela'zquez's landscape and Goya's campfire, from Quevedo's melancholy to the precious apple checks of Majorcan peasant girls, Dari'o traveled over the land of Spain as if it were his own land.

Neruda : The tide brought him to Chile, the warm sea of the North, and the sea left him there, abandoned on the rugged, rock-toothed coast, and the ocean pounded him with foam and bells, and Valparai'so's black wind covered him with songs of salt. Tonight let us make him a statue of air and let smoke, voices, circumstances, and life flow through it,

like his magnificent poetry with dreams and sounds flowing through it.

Lorca : But I want to give this statue of air blood like a coral branch stirred by the sea ; nerves like a cluster of lightning in a photograph ; the head of a minotaur with Go'ngora's snow painted on by a flight of hummingbirds ; the wandering and absent eyes of a millionaire of tears ; and also his failings. Shelving eaten away by hedge mustard, where the empty spaces are echoes of a flute ; the cognac bottles of his spectacular drunken sprees ; his charming lack of taste ; and the barefaced verbal stunts that make the vast majority of his poems so human. The fertile substance of his great poetry stands outside norms, forms or schools.

Neruda : Federico Garci'a Lorca, a Spaniard and I, a Chilean, turn over the honour of this evening among friends to that great shadow who sang more loftily than we and hailed with his unique voice the Argentine soil on which we stand.

Lorca : Pablo Neruda, a Chilean, and I, a Spaniard, linked by our language and by the person of the great Nicaraguan, Argentine, Chilean, and spanish poet, Rube'n Dari'o.

Neruda and Lorca : In whose honor and glory we raise our glasses !

I remember an evening when I received unexpected support from Federico in a colossal erotic escapade. We had been invited out by one of those millionaries that only Argentina or the United States can produce. He was a born rebel, a self-made man who had amassed a fantastic fortune with a sensationalist newspaper. Girded by an immense park, his house was the dynamic nouveau riche's dream come true. Cages by the hundreds, with many-colored pheasants from all over the world, lined the driveway. His library consisted of antique books bought by cable at bookdealer's auctions throughout Europe, and what's more, it was quite comprehensive and filled to capacity. But the most spectacular thing about it was the floor of his enormous reading room, every inch of which was covered with panther skins sewed together into a single, gigantic carpet. I learned that the man had agents in Africa, Asia, and

the Amazon, commissioned exclusively to collect the skins of leopards, ocelots, fabulous cats, whose spots now glistened beneath my feet in this ornate library.

That's what it was like in the home of Natalio Botana, a notorious, powerful capitalist, who dominated public opinion in Buenos Aires. At the table, Federico and I sat on either side of the host and across from a tall, ethereal lady poet who kept her green eyes on me more than on Federico during dinner. This consisted of a whole steer brought right to the hot coals and ashes in an enormous handbarrow on the shoulders of eight or ten gauchos. The evening sky was a fierce blue, and starry. The aroma of the beef roasted in its hide, sublime invention of the Argentines, mingled with the breath of the pampas, the scent of clover and mint, and the chatter of a thousand crickets and tadpoles.

The lady poet and I, along with Federico, who was delighted and moved to laughter by everything, rose from the table after dinner and went off toward the lighted swimming pool. Garci'a Lorca walked in the lead, chatting and laughing. He was happy. He was always like that. Happiness was as much a part of him as his skin.

A high tower soared above the shimmering świmming pool, dominating it. The whiteness of its lime was phosphorescent under the night lights.

We climbed slowly to the tower's highest lookout. Up there the three of us, poets of different styles, were far removed from the world. The pool's blue eye gleamed below. Farther off, we could hear guitars and singing from the party. Over us the night hung so close, swarming with such a multitude of stars, that it seemed to envelop our heads, submerging them in its depths.

I took the tall, golden girl in my arms, and when I kissed her, I found her sensual, well fleshed, all woman. To Federico's surprise, we lay on the floor of the lookout, and I was starting to undress her, when I caught his enormous eyes staring down at us, not fully beleiving what was happening.

"Get out of here ! Go see that nobody comes up the stairs!" I shouted at him.

As the sacrifice to the starry and the Aphrodite of the night was about to be consummated high in the tower, Federico hustled off cheerfully on his mission as aide and sentinel, with such ill fortune, however, that he rolled down the tower's darkened steps. The lady and I had to go help him up, with great difficulty. And he hobbled round for two weeks.

What a poet ! I have never seen grace and genius, a winged heart and a crystalline waterfall, come together in anyone else as they did in him. Federico Garci'a Lorca was the extravagant "duende," his was a magnetic joyfulness that generated a zest for life in his heart and radiated it like a planet. Openhearte and comical, worldly and provincial, an extraordinary musical talent, a splendid mime, easily alarmed and supersititious, radiant and noble, he was the epitome of Spain through the ages, of her popular tradition. Of Arabic-Andalusian roots, he brightened and perfumed like jasmine the stage set of a Spain that, also, is gone forever.

Garci'a Lorca's monumental command of metaphor seduced me, and everything he wrote attracted me. For his part, he would sometimes ask me to read him my latest poems, and halfway through the reading he would break in, shouting : "Stop, stop, I'm letting myself be influenced by you !"

In the theater and in a silence, in a crowd and in a small group, he generated beauty. I have never known anyone else with such magical hands, I never had a brother who loved laughter more. He laughed, sang, played the piano, leaped, invented, he sparkled. Poor friend, he had all the natural gifts, and dhe was a goldsmith, a drone in the hive of great poetry, but he also wasted his creative talent sometimes.

"Listen," he would say, taking hold of my arm, "do you see that window ? Don't you think it's chorpatelic ?"

"And what does 'chorpatelic' mean ?'

"I don't know either, but one must know what is and what's not chorpatelic. Otherwise, you're lost. Look at the dog, he's really chorpatelic !"

Or he would tell me that he had been invited to a ceremony commemorating *Don Quixote* at a school for boys, and that when

he walked into the classroom the children, led by the headmistress, sang :

This book, which was explicated
by F. Rodri'guez Mari'n (Ph. D.),
will be everywhere celebrated
forever and ever. Amen.

Once I gave a talk on Garci'a Lorca, years after his death, and someone in the audience asked me : "In your 'Oda a Federic. Garci'a Lorca.' why do you say that they paint hospitals blue for him ?"

"Look, my friend," I replied, "asking a poet that kind of question is like asking a woman her age. Poetry is not static matter but a flowing current that quite often escapes from the hands of the creator himself His raw material consists of elements that are and at the same time are not, of things that exist and do not exist. Anyway, I'll try to give you an honest answer. For me, blue is the most beautiful colour. It suggests space as man sees it, like the dome of the sky, rising toward liberty and joy. Federico's presence, his personal magic, instilled a mood of joy around him. My line probably means that even hospitals, even the sadness of hospitals, could be transformed by the magic spell of his influence and suddenly changed into beautiful blue buildings."

Federico had a premonition of his death. Once, shortly after returning from a theatrical tour, he called me up to tell me about a strange incident. He had arrived with the La Barraca troupe at some out of-the-way village in Castile and camped on the edge of town. Overtired because of the pressures of the trip, Federico could not sleep. He got up at dawn and went out to wander around alone. It was cold, the knife-like cold that Castile reserves for the traveler, the outs ider. The mist separated into white masses, giving everything a ghostly dimension.

A huge rusted iron grating. Broken statues and pillars fallen among decaying leaves. He had stopped at the gate of an old estate, the entrance to the immense park of a feudal manor. Its state of abandonment, the hour, and the cold made

the solitude even more penetrating. Suddenly Federico felt oppressed as if by something about to come out of the dawn, something about to happen. He sat down on tne broken-off capital of a pillar lying toppled there.

A tiny lamb came out to browse in the weeds among the ruins, appearing like an angel of mist, out of nowhere, to turn solitude into something human, dropping like a gentle petal on the solitude of the place. The poet no longer felt alone. Suddenly a herd of swine also came into the area. There were four or five dark animals, half-wild pigs with a savage hunger and hoofs like rocks. Then Federico witnessed a blood-curdling scene : the swine fell on the lamb and, to the great horror of the poet, tore it to pieces and devoured it.

This bloody scene in that lonely place made Federico take his touring company back on the road immediately. Three months before the civil war, when he told me this chilling story, Federico was still haunted by the horror of it. Later on I saw, more and more clearly, that the incident had been a vision of his own death, the premonition of his incredible tragedy.

Federico Garci'a Lorca was not merely shot ; he was assassinated. It would never have crossed anyone's mind that they would kill him one day. He was the most loved, the most cherished, of all spanish poets. and he was the closes to being a child, because of his marvelous happy temperament. Who could have believed there were monsters on this earth, in his own Granada, capable of such an inconceivable crime ?

This criminal act was for me the most painful in the course of a long struggle. Spain was always a battleground of gladiators, a country where much blood has flowed. The bull ring, with its sacrifice and its cruel elegance, repeats—glamorized in a flamboyant spectacle – the age-old struggle to the death between darkness and light.

বিশেষ রচনা

কি পড়ি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বইয়ের ব্যাপারে আমার খুব একটা বাছবিচার নেই। হাতের কাছে যা পাই তাই পড়ি, এমনকি ঠোঙা পর্যন্ত। এবং কোনো নতুন বই পেলে দু'চার পাতা উল্টে দেখে নিই, যে সেটি শেষ পর্যন্ত পড়ার যোগ্য কিনা।

আমার বই পড়ার প্রথম নেশা জাগে ডিটেকটিভ কাহিনী থেকে। এখনো সেই নেশা আছে, দেশ বিদেশের বহু ডিটেকটিভ বই আমি পড়েছি, তবে যেদিন থেকে গোয়েন্দারা মাথার বদলে হাত পায়ের ব্যবহার বেশী শুরু করলে, সেদিন থেকে আগ্রহটা একটু কমতে শুরু করেছে। সারা বিশ্বের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়তর গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক জর্জ সিমোনো।

বই কিনে পড়ার সাধ্য ছিল না বলে আমি কৈশোর থেকেই লাইব্রেরিতে যাতায়াত শুরু করি। উত্তর কলকাতার বয়েজ ওন লাইব্রেরি থেকে আমি প্রতিদিন দুটি করে বই আনতাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কে কী জাতের লেখক তা আমাকে কেউ বলে দেয়নি বা কোনো সমালোচনা পড়েও আমায় জানতে হয়নি। কলেজ জীবনে আমার গর্ব ছিল যে আমার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমার চেয়ে বেশী বাংলা বই পড়েছে। পাঁচকড়ি দে'র নাম অনেকে শুনেছে কিন্তু অনেকেই তাঁর কোনো বই পড়েনি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতন একজন চমৎকার শিশু-কাহিনী লেখকের কথা ক'জন জানে? কিছুদিন পরে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এই গর্ব ভেঙে দেয়। মানব একজন সত্যিকারের পড়ুয়া।

আমার ধারণা, শুধু বাংলা বইয়ের মাধ্যমেই সারা পৃথিবীর সাহিত্য সম্পর্কে

মোটামুটি অবহিত হওয়া যায়। বাংলায় এমন বিপুল সংখ্যক ও বিচিত্র বই আছে। আমরা বাংলা স্কুলের ছাত্র, স্কুল জীবনে নিজের চেষ্টায় পুরো একটা ইংরেজি বই পড়ে ফেলতে খুব কষ্ট হতো। মনে আছে, প্রথম যে ইংরেজি উপন্যাসটি আমি একটানা পড়ে শেষ করি, সেটি অসকার ওয়াইল্ডের পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে। এই ঘটনাটি ঘটেছিল আমার ক্লাস টেন বয়েসে।

কবিতা বারবার পড়া যায়, কিন্তু যে গদ্য গ্রন্থটি আমি জীবনে অন্তত একশো-বার পড়েছি, সেটি কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত। মহাভারত পড়া আমার নেশা। আমি বর্ধমানরাজ-সংস্করণ এবং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারতও পড়েছি, এবং এখনো, প্রায়ই মহাভারতের যে কোনো পাতা খুলে পড়তে থাকি এবং আনন্দ পাই এবং প্রত্যেকবার নতুন কিছু আবিষ্কার করি। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য যে নতুন রাজধানী তৈরি হলো, তার সভাকক্ষটি যে একটি সাততলা বাড়ি, তা এই সেদিনও জানতাম না।

আমি কনফার্মড নাস্তিক, কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলি পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। কোরাণ ও বাইবেল পড়েছি ইংরেজি অনুবাদে, এই দুই গ্রন্থের সাহিত্যগুণসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ আজও আমার চোখে পড়েনি। বাংলা ভাষায় প্রথম কোরাণের অনুবাদ করেন গিরিশচন্দ্র সেন, যাঁর ডাক নাম ছিল মৌলবী গিরিশ, ছেলেবেলায় তাঁর সেই কোরাণ পাতা ছেঁড়া অবস্থায় পেয়ে পড়েছিলাম। এখন তাঁর সেই বইটির পুনর্মুদ্রণ হলে বেশ হয়। মীর মসারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' এখন আবার পাওয়া যায়, অতি উত্তম বই। বেদ-উপনিষদ পাঠ করা আমাদের পক্ষে সহজ। মূল সংস্কৃতের নীচে আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ দেওয়া অনেক সংস্করণ পাওয়া যায়, আমি সংস্কৃত খুবই কম জানলেও মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি মিলিয়ে পড়তে বেশ মজা পাই। অবশ্য, বেদকে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলা নিছক বাতুলতা। কবে থেকে কে বা কারা এটা রটিয়েছে কে জানে। বেদে ধর্মের নাম গন্ধ নেই, আছে দেবদেবীদের সম্পর্কে বেশ কিছু স্খলিত কবিতা। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই প্রথম বলেছিলেন যে পল গ্রেভ সাহেবের 'গোল্ডেন ট্রেজারির' মতন বেদ একটি বা অনেকগুলি কবিতার সংকলন মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাবলী যিনি পড়েন নি, তিনি প্রকৃতই বঞ্চিত, তিনি বাংলা ভাষার ষ্টাইল সম্পর্কে সম্যক জানেন না। আমার মতে, বাংলায় প্রথম চমৎকার অশ্লীল রচনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনূদিত গদ্য মেঘদূত।

এক সময় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, এগুলিই বেশী পড়তাম। বয়েস পঁয়ত্রিশ

পেরবার পর থেকেই লক্ষ্য করছি, গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে আগ্রহ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। একেই কি বলে বয়সের দোষ। এখন বেশী ভালো লাগে ভ্রমণ কাহিনী ও ইতিহাস। আবার ঐতিহাসিকরা যখন ভ্রমণ কাহিনী লেখেন, তখন তা হয় আরও অপূর্ব, যেমন টয়েনবী সাহেব লিখেছেন, 'বিটুইন অক্সাস অ্যাণ্ড যুমনা (যমুনা)' কিন্তু হায়, এরকম বই বড়ই দুর্লভ। প্রধানত পর্যোগ্রাফি লেখক হিসেবে পরিচিত হেনরি মিলারের লেখা একটি গ্রীসের ওপর ভ্রমণ কাহিনীতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। (কলোসাস অব মারোউসি) আমাদের নীহাররঞ্জন রায়ের হাত থেকে কী এরকম একটি ভ্রমণ কাহিনী বেরুতে পারতো না? সেই রকমই আকৃষ্ট করে আত্মজীবনী ও জীবনী। কবিদের জীবনী অন্য কারুর পক্ষে রচনা করা সবচেয়ে শক্ত কাজ। তবু, র‍্যাঁবোর কবিতা খুব ভালো করে পড়বার আগে, ইনিড স্টার্কির লেখা র‍্যাঁবোর অপূর্ব জীবনীটি পড়ে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে তারপর র‍্যাঁবোর কবিতা পড়তে আরও বেশী আগ্রহী হই। উনি বদলেয়ারেরও একটি ভালো জীবনী লিখেছেন। আর ইতিহাস ও জীবনী একসঙ্গে মিশিয়ে লেখার খুব ভালো দৃষ্টান্ত বাংলায় তেমন নেই, যেমন ধরা যাক, রাল্‌ফ রোয়েডার-এর লেখা 'দা ম্যান অব দা রেনেসাঁস'।

জীবনে অনেক বইই পড়া বাকি আছে ও বাকি থেকে যাবে। যেমন, আমি জেমস জয়েসের 'ফিনেগারস ওয়েক' আজও পড়ে উঠতে পারিনি। প্রুস্তের 'অতীতের অনুসন্ধান'-এর মাত্র তিন খণ্ড পড়েছি, বাকি খণ্ডগুলি এখনও পড়া হয়ে উঠলো না। আরও এমন কত বইয়ের জন্য দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কিছুকিছু পড়াশুনা একটু গোঁজামিল ধরনের হয়। যথা, কার্ল মার্কসের ডাস ক্যাপিটাল আমি পড়তে পারিনি। ঐ বই সম্পর্কে নানান আলোচনা ও টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি পড়েই অনেক সময় লোকজনের মধ্যে এমন একটা ভাব দেখাতে পারি, যেন সবটাই আমার জানা, এরকম দুর্বলতা মানুষের থাকেই। যাঁরা ডাস ক্যাপিটাল গোটাটাই পড়েছেন এবং বুঝেছেন, তাঁরা আমার নমস্য। অবশ্য, তাঁদের তুলনায় হয়তো আমি মহাভারত বেশী পড়েছি, এই ভেবে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারি।

জ্ঞানলাভের জন্য নয়, শুধু আনন্দ লাভের জন্য যদি কোনো বই পড়তে হয়, তবে আমার মতে, এ পৃথিবীতে এখনও মহাভারতই শ্রেষ্ঠ বই।

Modern Poets

GEORGE SEFERIS

A Poet's Journal : Days of 1945-51 $ 2.95

ANTONIO MACHADO

Castilian Ilexes $ 2.50

NICOLAS GUILLEN

The Great Zoo and Other Poems $ 3.25

LAWRENCE DURRELL

Selected Poems £ 1.50

PEDRO PIETRI

Puerto Rican Obituary $ 2,95

EZRA POUND

The Pisan Cantos £ 0.80

The Translations £ 1.50

KALEEM OMAR, MAKI KUREISHI & TANFIQ RAFAT

Wordfall $ 3.00

BRUCE JACKSON

Get your Ass in the Water and Swim Like Me

Narrative Poetry from Black Oral Tradition.

They represent a vital, practically unknown genre of black folklore. They come from the world of the street and joint, hobo campfires, prison, and the most popular poetry books, and are heard at street corners, at parties, and among inmates in country jails. It is a mine of poetry, humorous, verbally coarse, lurid, eye-opening, often highly obscene. $ 6.95

Oxford University Press
P-17 Mission Row Extension
Calcutta-700 013
DELHI BOMBAY MADRAS

বিনয় ঘোষের কয়েকখানি বাংলা বই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

১ম/২য় খণ্ড—৪০.০০

৩য় খণ্ড ছাপা হচ্ছে : ৪৫.০০

কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত ৪৫.০০

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩০.০০

দ্বিতীয় সংস্করণ

বাংলার বিদ্বৎসমাজ ১৫.০০

দ্বিতীয় সংস্করণ

মেট্রপলিটন মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ ১৫.০০

দ্বিতীয় সংস্করণ

বাদশাহী আমল ১৪.০০

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

নবপরিকল্পিত নতুন সংস্করণ

দশখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড ১৮.০০/২০.০০

দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

অটোমেটিক জীবন ও সমাজ ১০.০০

প্রথম প্রবন্ধসংকলন

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধসংকলন ১০.০০/১২.০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

জনসভার সাহিত্য ১৫.০০

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ

বাংলার নবজাগৃতি ১৫.০০

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ অক্টোবরে প্রকাশিত হবে।

সমস্ত সম্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে।

প্রবন্ধ

উনিশ শতকের বাঙালী জীবনে পঞ্জিকা

অমলেন্দু দে / বিনয়ভূষণ রায়

ধর্মভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় দৈনন্দিন খুঁটিনাটি বিষয়ে ধর্মীয় নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে মানুষের যে অসুবিধা দেখা যায়, বোধ হয় সেই অভাব মোচনের জন্যই সৃষ্টি হয় পঞ্জিকার। উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পঞ্জিকার প্রভাব ছিল অসীম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কাজেই তাঁরা পঞ্জিকা দেখতেন। তাই ছাপাখানা স্থাপনের পর বাঙালী বৎসর শুরু হওয়ার আগেই পঞ্জিকা বিক্রয়কারীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যেত। হকারেরা ছাপাখানা হতে পঞ্জিকা কিনে নিয়ে দূর-দূরান্তে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যেত। যে সমস্ত অঞ্চলে অন্যান্য বাংলা বই যেত না সেই সমস্ত অঞ্চলেও পঞ্জিকা যেত। এই প্রসঙ্গে রেভঃ জেমস্ লঙ্ বলেন—

"Almanacs circulate where few other Bengali books reach, just previous to the beginning of the bengali year is a busy season with the native Almanac seller of Calcutta, book-hawkers in numbers may be seen issuing from the printing press, frightened with the store of Almanacs which they carry far and wide some of which they sell at the low rate of 80 pages for one anna," (১)

১. হিন্দু পঞ্জিকা

ছাপা পঞ্জিকা প্রকাশ হওয়ার আগে উপরের চিত্রটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা হাতের লেখা পঞ্জিকা বিক্রয় করে জীবিকা অর্জন করতেন। বংশানুক্রমে এটাই ছিল তাঁদের পেশা।(২) পঞ্জিকার পাণ্ডুলিপি

কাপড়ে জড়িয়ে বগলদাবা করে তাঁরা লোকেদের দরজায়-দরজায় ঘুরে বেড়াতেন। এটা তাঁদের পেশার প্রতীক হিসাবে কাজ করত এবং এর বলে তাঁরা স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুরেও ঢুকতে পারতেন। সেখানে তাঁদের পারিবারিক শুভাশুভ নির্ণয় করতে হত। এর পরিবর্তে তাঁরা কিছু চাল পেতেন। গৃহস্বামীকে বশ করতে পারলে তাঁদের ভাগ্যে কিছু উপরি-পাওনাও জুটে যেত। কোনো পরিবারের শিশু অসুস্থ হলে স্ত্রীলোকেরা তার গ্রহজনিত কারণ এবং তার প্রতিকারের জন্য সর্বদাই উন্মুখ থাকত। ফলে তাঁদের ভাগ্যে অধিক উপরি-পাওনার সুযোগ হত। তাঁদের প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে, লোকে অনেক সময় গরীব এবং ব্রাহ্মণদের খালিহাতে ফিরিয়ে দিত, কিন্তু কখনও কোনো জ্যোতিষীদের পাওনা দিতে ভুল করত না। এই সম্বন্ধে তখনকার এক পত্রিকায় বলা হয়—

"They move out to their daily vocation, with an almanac wrapped in a cloth under the arm, this is the badge of their profession and their passport to the most sacred privacy of a Hindu family, the appartment of the women. Arrived at the door of the house, the astrologer invoking the sun, the patron of his tribe, pronounces a secret text, and the five heavenly conjunctions of that day, for the hearing of which the Shastras have promissed a splendid reward, the destructions of bad dreams, the forgiveness of sins, increase of days of wisdom, good fortune and happiness. He receives a few grains of rice for his attention, gives his benison and departs. The most niggardly native, from whose door the poor and even the Brahmins depart empty away, never refuses his rice to the astrologer. Sometimes he may succeed in persuading the master of the house that some planets regard him with a malignent aspect, and that a few annas will enable him (the astrologer) propitiate it, or a child may be ill and the women may be desirious of knowledge what planet had caused it and how its sinster may be desirous of knowing what planet had caused it, and how its sinster may be averted their will add a little more to his gains. (৩)

কখনো কখনো বা তাঁরা বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতেন এবং যারা আগামী বৎসরে তাদের বর্ষফল জানতে চাইত তাদের কাছে তা তাঁরা পঞ্জিকা

হতে পড়ে শুনাতেন। এর জন্য তাঁরা স্থান ভেদে এক টাকা হতে চার টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা পেতেন। (৪) কিন্তু ছাপা পঞ্জিকা প্রচার হওয়ার ফলে দৈবজ্ঞদের আয়ের পথ ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আসে। লোকে হাতে-লেখা পঞ্জিকার চেয়েও বেশী মূল্যে (এক টাকা দিয়ে) পঞ্জিকা কিনতে থাকে। বেশী সংবাদই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। (৫)

প্রথম হাতে-লেখা পঞ্জিকার খবর পাওয়া যায় ১৭২৯ শকাব্দে (ইং ১৮০৭)। এই পঞ্জিকা নবদ্বীপের রাজা গিরীশচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় একজন বিদ্যাশিরোমণি সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী রচনা করেন। তা আকৃতিতে ১৬ ইঞ্চি লম্বা ও ২½ ইঞ্চি চওড়া ছিল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৬। আগেকার হাতে-লেখা পুঁথির মত মাঝখানে একটি মাত্র সুতার দ্বারা আটকান ছিল। এর আনুমানিক মূল্য ছিল ৬-৮ আনা।৫ (ক) ঐ পঞ্জিকা অনুযায়ী উক্ত বৎসরের রাজা ছিল বৃহস্পতি এবং প্রধানমন্ত্রী ছিল রবি। বুধ জলাধিপতি এবং শনি শস্যাধিপতি ছিলেন। মেঘেদের রাজা ছিল চারটি মেঘের অন্যতম দ্রোণ। সাতটি বাতাসের একটি অভুহ (Avuhu) বাতাসদের উপর রাজত্ব করছিল। অষ্ট নাগের এক নাগ মহাপদ্ম তাদের নেতৃত্বে ছিলেন। আটটি হাতির একটি সুপ্রতীক হাতিদের রাজা ছিল। ফলে বর্ষফল পর্যালোচনা করে ঐ পঞ্জিকায় বলা হয়—

"The earth will this year be watered from the salt sea, one of the seven seas, the benefits of the kingly authority will be such as arise from the reign of Jupiter, viz, the peace and safety, freedom from disease plenty all over the earth, the rain in its seasons but the effects of ministerial Council will be evil; the gods of the water will give abundance; the god of the harvest will not be propitious ; when Drona, the god of clouds, presides, there will be great plenty." ৫(খ)

তৎকালীন প্রত্যেকটি অবস্থাপন্ন লোকের ঘরেই পঞ্জিকা রাখা হত। তাছাড়া হিন্দুদের উৎসব-সংখ্যা এত বেশী যে পঞ্জিকা ছাড়া মনে রাখা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকটি হিন্দুর কাছে পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা কি, তা উল্লেখ করে উইলিয়াম ওয়ার্ড বলেন—

"This almanac is in the houses of almost all the respectable natives, and indeed is necessary for their use, seeing the times for celebrating so many of the Hindu festivals are thereby regulated. It is time there are a number of other annual ceremonies,

derived from the tantra shastras, and besides these annual ceremonies, there are hundreds of other acts of idolatory, which are done whenever it is the pleaure of the worshiper. Indeed for any one man to perform all the prescribed duties of the Hindu idolatory is impossible, they are almost boundless."৫(গ)

যে সমস্ত স্থানে তখন পঞ্জিকা প্রকাশিত হত তার মধ্যে বালি, গুপ্তপুর, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, দিগসুই, বিক্রমপুর, বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, বহরমপুর ইত্যাদির নাম ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হতেই নদীয়া থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকার খ্যাতি বেশী ছিল।(৬)

প্রাচীন পঞ্জিকায় বিস্তারিত ভাবে কিছু লেখা থাকত না। বর্তমান পঞ্জিকার বাম পার্শ্বে অঙ্কের দ্বারা যে সাংকেতিক অক্ষর লেখা থাকে, আগের পঞ্জিকায় শুধু তাই থাকত। সাধারণ লোকে এর অর্থ বুঝত না। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞগণ তার অর্থ করে সাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামহরি নামে এক ব্যক্তি তার অর্থ ভাষায় প্রকাশ করে শ্রীরামপুর হতে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হতে একটি নূতন বড় পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় একখানি পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। তা "কলেজের পঞ্জিকা" নামে খ্যাত ছিল।৬(ক) ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন এর সংকলক এবং অগ্রদ্বীপের এক ছাপাখানা হতে তা প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণনগরের রাজার নামে এই পঞ্জিকা উৎসর্গ হয়েছিল।(৭) এই পঞ্জিকা হতে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাতে তখনকার লোকের ধর্মভীরুতা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। তখনকার লোক শুভ-অশুভ দিন অনুসারে তাদের শুভ কাজ করত। তাই ঐ পঞ্জিকা অনুসারে ২১শে বৈশাখ হতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১লা শ্রাবণ হতে ১৬ই আশ্বিন এবং ২৯শে পৌষ হতে ১০ই বৈশাখ ছিল অশুভ দিন। এ ছাড়া আর-সমস্ত দিনই ছিল শুভ। সব শুভ দিনে যে কোনো শুভ কাজ করা যেত না। বিভিন্ন শুভ কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিন ধার্য করা হত। যেমন ঐ বৎসর মোট বিয়ের দিন ছিল ২২টি। তার মধ্যে বৈশাখ মাসে ছিল ২ দিন, জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিল ৩দিন, অগ্রহায়ণ মাসে ছিল ৭ দিন, ফাল্গুন মাসে ছিল ১দিন এবং চৈত্র মাসে ছিল ৩ দিন। শিশুদের মুখেভাতের (অন্নপ্রাশনের) জন্য ছিল ২৭টি দিন। পঞ্চামৃতের দিন ছিল ১২টি। এ ছাড়া গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশের সবচেয়ে ভাল দিন ছিল ১০ই বৈশাখ, ৭ই এবং ১৪ই আষাঢ় এবং কান-ফোঁড়ান'র দিন ছিল ২৮শে আষাঢ় ও ৬ই অগ্রহায়ণ, বিদ্যারম্ভের সবচেয়ে ভাল দিন ছিল ১৭ই বৈশাখ,

৭ই এবং ১৪ই আষাঢ়। (৮) কিন্তু বাংলা ১২৪২ (ইং ১৮৩৫) সালে পঞ্জিকা (একই স্থান হতে প্রকাশিত) মতে বিয়ের দিন ছিল ২৯, মুখেভাত বা অন্নপ্রাশনের দিন ছিল ২৫, পৈতা বা উপনয়নের দিন ছিল ৫, নবান্নের দিন ছিল ১, হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভের দিন ছিল ২ এবং নববিবাহিত বধূকে স্বামীর বাড়ীতে আনার জন্য ছিল ৩ দিন।(৯)

পঞ্জিকাতে শুধু বিয়ের দিনই বলে দিত না, বিয়ের বয়স এবং মাসও বলে দিত। সেই অনুসারে সমস্ত কন্যাকেই ৮, ৯ অথবা ১০ বৎসরের মধ্যেই বিয়ে দিতে হত। ১০ বৎসরের মধ্যে বিয়ে দিতে না পারলে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হত। মাস অনুসারে আষাঢ় মাসে কোনো মেয়ের বিয়ে হলে তাকে ভয়ানক কষ্টের মধ্যে কাটাতে হত। শ্রাবণ ও পৌষ মাসে হলে তাদের সন্তান মারা যেত। ভাদ্র মাসে হলে সে অবিশ্বস্ত হত। আশ্বিনে হলে সে মারা যাবে, কার্তিকে হলে সে অন্যের ভুগবে এবং চৈত্রে হলে সে অহংকারী হবে।(১০) জন্মনক্ষত্রও বিয়ের ক্ষেত্রে ভয়ানকভাবে মেনে চলা হত। হিন্দু জ্যোতিষি মতে জন্মের উপর ২৭টি নক্ষত্রের প্রভাব আছে। তার মধ্যে ৯টির ধর্ম দেবতাদের মত, ৯টির ধর্ম রাক্ষসের মত, এবং ৯টির ধর্ম মানুষের মত। সকলেই জানে যে দেবতাদের সঙ্গে রাক্ষসের লড়াই লেগে থাকে। সুতরাং দেব-ধর্মের নক্ষত্রে জন্ম এমন কোনো ছেলে বা মেয়ের সাথে রাক্ষস ধর্মে নক্ষত্রে জন্ম এমন কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। তাই বিয়ের আগে পাত্র এবং পাত্রীর অভিভাবকের প্রথম কাজ ছিল তাদের জন্মনক্ষত্র খোঁজ নেওয়া। পাত্র-পাত্রীর জন্ম একই নক্ষত্রে হলে তারা সুখী হবে বলে মনে করা হত।(১১) এত করেও পাত্র-পাত্রী বিয়ের পর সব সময়ে সুখী হত না। এই বিষয়ে তখনকার পত্রিকায় এক চমকপ্রদ ঘটনা প্রকাশিত হয়। সেই ঘটনার বর্ণনা এখানে হুবহু তুলে ধরা হল—

"Some thirty years ago a rich native in our neighbourhood of good moral character, but a most devoted slave to every Hindu obseravance, on the occasion of his daughter's marriage spared no labour and expense to secure every possible auspicious conjunction for the match. He expended a lakh of rupees upon the astrologers, and it may easily be fancied how great a number was mastered. Every man for fifty miles round, who had any pretentions to an acquitance with this science folked to him ; and for six months was he employed day and night in examining with them, the nativites of the several bride-

ছাপা বইএর মধ্যে পঞ্জিকার স্থান ছিল প্রথম। বৎসরে প্রায় ২½ লক্ষ কপি ছাপান হত।(২০)

২. খ্রীষ্টান পঞ্জিকা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই দেশীয় খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের পৌত্তলিক পঞ্জিকার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথক পঞ্জিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা খ্রীষ্টান মহলে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে "The Friends of India"র বক্তব্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই পত্রিকার মতে

"...of these almancs, the most popular we belive is that which issues annually from the press of Krishna Chundar in this town, and of which no fewer than 4000 copies are printed and disposed of at the low rate of eight annas of copy. They are exclusively adapted to the institution of idolatory and embodied all it is necessory for the Hindu regarding the various service and ceremonies, with which his ritual has crowded the year. They have a direct tendency to foster the spirit and to perpetuate the observance of Hinduism. It was highly desirable, there fore, that another almanac should be prepared for the native Christians, comprising all the information necessory for the secular business of life and freed from all superstitious referenccs." (২১)

ঐ অভাব পূরণের জন্য ক্যালকাটা খ্রীশ্চিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটি উদ্যোগ নেন এবং তারই ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা ভাষায় একখানি খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পঞ্জিকার প্রথম বারো পৃষ্ঠায় সৌর জগত ও প্রধান প্রধান গ্রহগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরের ১৮ পৃষ্ঠায় ইংরাজী ও হিন্দু নিয়ম অনুযায়ী সময়ের (ঘণ্টা, মিনিট, ইত্যাদি) উপর আলোচনা করা হয়েছে। ইহা ছাড়া দিনের মধ্যে ইংরাজী, হিন্দু ও মুসলমান দিন এবং সৌর ও চন্দ্রমাস সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। খ্রীষ্টাব্দ, শকাব্দ, হিজরা, মার্গী, (চট্টগ্রামে প্রচলিত অব্দ), বিলায়তী (উড়িষ্যায় প্রচলিত অব্দ), ফলসী (হিন্দুস্তানী অব্দ), এবং বাংলা সালও ঐ সাথে আলোচনা করা হয়। ৩০ হইতে ৩৭ পৃষ্ঠায় ঐ পঞ্জিকার অনুসৃত পদ্ধতির ব্যাখ্যা, নতুন গ্রহের আবিষ্কার এবং ঐ বৎসরের গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৩৮ হইতে ৬৯ পৃষ্ঠায় মূল পঞ্জিকা স্থান পেয়েছে। প্রতি মাসের হিসাব উহার প্রতি দুই পাতার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া

সাপ্তাহিক দিনগুলির সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমান তারিখও ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজী মতে সূর্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, ছুটির দিনের তালিকা এবং বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষত্ব এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও আলোচিত হয়েছে। পরিশিষ্টে ইহুদী মত অনুসারে সময় গণনা, উৎসবের তারিখ, বৎসর, ওজন, মুদ্রা এবং উহার বাংলায় রূপান্তর সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। পোষ্ট অফিসের নিয়ম-কানুন, মাশুলের হার, সুপ্রীম কোর্টের সময়, সিক্কা টাকার, কোম্পানীর টাকার এবং কোম্পানীর টাকা সিক্কা টাকায় রূপান্তর সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে বিভিন্ন মিশনারী সোসাইটির সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে।(২২)

খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকায় প্রকাশিত সমস্ত তথ্যই যে নিখুঁত ছিল একথা সত্য নয়। এই বিষয়ে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের একখানি খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা সম্পর্কে "সত্যপ্রদীপে"র তথ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাতে বলা হয়, "নেপ্চুন নামে এক নূতন গ্রহ ১৮৪৬ সালে প্রকাশ হয় তাহা গ্রহের তালিকায় লিখিত হইয়াছে বটে কিন্তু পঞ্জিকা কর্তারা কহেন তাহার পরিমাণাদি স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহাতে তাহাদের ভ্রম হইয়াছে যেহেতুক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক এক নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে লেখা ঐ গ্রহের ব্যাস ২৫,০০০ ক্রোশ ও সূর্য হইতে তাহার দূরত্ব ১,৬০,০০,০০০ ক্রোশ আর ঐ গ্রহের এক বৎসর আমাদের প্রায় ২১৭ বৎসরের তুল্য।"(২৩)

কিন্তু ঐ পঞ্জিকায় আলোচিত বিষয়বস্তু এদেশীয়দের কাছে ভিন্ন দেশী রুচিসম্পন্ন হওয়াতে উহার বিশেষ বিক্রী হত না।(২৪) পরিশিষ্টে ঐ পঞ্জিকার কিছু অংশ তুলে ধরা হল। প্রচারের মাধ্যম হিসাবেও বিভিন্ন ব্যবসায়ী কোম্পানীও ঐ সময়ে পঞ্জিকা প্রকাশ করত। এই বিষয়ে মেসারস্ কোনস্ এণ্ড কোং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ কোম্পানী ৩০৪ পৃষ্ঠার এক পঞ্জিকা প্রকাশ করে। উহার মূল্য ছিল সাত আনা. ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার কপি প্রায় ২০,০০০ বিক্রী হয়।(২৫)

১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজ কর্তৃক বিবিধ ব্যবহারোপযোগী বিষয় সম্বলিত "নূতন-পঞ্জিকা" প্রকাশিত হয়। উহা অল্প মূল্যে (২০০ পৃষ্ঠা মাত্র চার আনা) বিক্রয় করা হত। ঐ পঞ্জিকাও বেশী চলে নাই। প্রথম বৎসর যেখানে ২৫০০ কপি বিক্রয় হয়েছিল, দ্বিতীয় বৎসর সেখানে মাত্র ৪১২ কপি বিক্রয় হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে রেভ : জেমস্ লঙ্ বলেন—

"In 1854-55 the vernacular literature commitee published a cheap almance 200 pp. at 4 annas a copy, the first year 2500

copies were sold, the next year only 419, the Hindus having discovered in the meanwhile, that though the almanac was got up in style and appearance like their own and contained much valuable information on medicine, plants and fairs, yet that all astrological matter was omitted." (২৬)

উহা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা, প্রথম ভাগ—ইহাতে সরকারী রাজস্ব দিবার দিন, এই দেশীয় পর্বের যাহাতে কোম্পানীর অফিস ইত্যাদি বন্ধ থাকে, সূর্যগ্রহণ, কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের দিন, পঞ্জিকা ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ভিন্ন ভিন্ন জিলার মেলা, মাসিক কৃষিকার্য, সিক্কা টাকা হতে কোম্পানীর টাকার হিসাব কোম্পানীর টাকা হতে সিক্কা টাকার হিসাব, মুনসেফ ও উকিলের কার্যতালিকা, বিভিন্ন আদালতে কার্যনির্বাহের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জিলার নানা স্থানীয় মেলার বিষয় আলোচনা-কালে জিলার নাম, যে যে স্থানে মেলা হয় সেই সমস্ত স্থানের নাম, শহর হতে সেই স্থানের দূরত্ব ও অবস্থান, মেলার তারিখ ও উহাতে বিক্রীত দ্রব্যের নাম, সংক্ষেপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রচলিত ওজনও সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। যথা, বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলায় সেই সময় দুই রকমের ওজন ছিল, যথা, কাঁচা ওজন ও পাকা ওজন। কাঁচা ওজন অনুসারে ৬০ তোলাতে সের হত এবং পাকা ওজন অনুসারে ৮০ তোলাতে সের হত। চাউলের ওজন কিন্তু আলাদা ছিল। উহা ওজন অনুসারে ৯৬ তোলাতে সের হত। (২৭)

নবদ্বীপের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় শিমুলিয়ার (কলিকাতা) রামকানাই দাস ও নিত্যানন্দ দাসের সুধাসিন্ধু যন্ত্রে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের "নূতন পঞ্জিকা" প্রকাশিত হয়। ইহাতে শুভদিনের নির্ঘণ্ট, হর-পার্বতী সংবাদ, বর্ষচক্র গণনা, আয় ব্যয় স্থিতি, দ্বাদশ রাশির ফল, নক্ষত্রিক দিকশুল, চন্দ্রশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি, শিবজ্ঞান, ডাকমাশুল, স্ট্যাম্প নিরূপণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।(২৮)

১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের নূতন পঞ্জিকায় অনেক নূতন বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। তার মধ্যে প্রত্যেক দিনের বাঙ্গলা নাম, মুসলমানী নাম, ইংরাজি নাম, মুসলমানের চাঁদ নিরূপণ, নানা দেশীয় বৎসর ও দিন নিদর্শন, বিভিন্ন নিয়মে বৎসর, কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের টেরস ও সিটিং, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ীর ভাড়া, সময়, নিয়মাদি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট (৩-১৬)-এ এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।]

৩. মুসলমান পঞ্জিকা

হিন্দুর তৈরী পঞ্জিকা যাতে মুসলমানগণ ব্যবহার না করেন তার জন্য উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমান পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৩০৩ (ইং ১৮৯৬) সালে মহম্মদ রিয়াসুদ্দিন আমেদ ১৮৪ পৃষ্ঠার "বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা" সঙ্কলন করেন। উহার মূল্য ছিল প্রতি কপি তিন আনা। উহা প্রায় ৫০০০ কপি প্রকাশিত হয়। উহার পরিশিষ্টে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান রাজ্যের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (২৯)

১৩০৪ সালেও উহার দুইটি সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ২০০০ কপি ও বৃহৎ সংস্করণের ৬০০০ কপি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বৎসর বৃহৎ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২১৬।(৩০)

সেই ধর্মীয় অনুশাসনের যুগে পঞ্জিকাই সাধারণের নির্দেশ দিত। ইহার মধ্যে শুধু সাধারণ খবরই পাওয়া যেত। ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ খবর পঞ্জিকায় পাওয়া যেত না। তার জন্য ছিল জ্যোতিষী। বড়লোকদের জন্য ঐ জ্যোতিষীদের দরজা সব সময়েই খোলা ছিল। এই বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কিছু আলোচনার প্রয়োজন। যথা—বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর বিশেষ নক্ষত্রের প্রভাব জানতে হলে পঞ্জিকা দিয়ে হত না। তার জন্য লাগত জ্যোতিষী। কিন্তু গরীবদের পক্ষে তাদের কাছে যাওয়ার আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাই তারা সাধারণ জীবন যাপন করত এবং নক্ষত্র সম্পর্কে সাধারণ বিচারেই খুসী থাকত।(৩১) অর্থাভাবে কাঁচা বাড়ী তৈরী করার সময় তারা জ্যোতিষীদের কাছ থেকে বুদ্ধি নিতে পারত না। কিন্তু বড়লোকেদের বেলায় জ্যোতিষীরা আপনা হতে তাদের কাছে উপস্থিত হত। এই প্রসঙ্গে তখনকার পত্রিকায় বলা হয়—

"A poor man may erect a thatched shed without attracting their attention, but if a man wish to raise a brick house, the astrologer will quickly discover him and offer to calculate the most ausipicious day for laying the foundation, and for entering on possession. A rich man has many friends but none so anxious for his welfare as the astrologer. The opulent retain an astrologer as they retain a physician, and he is deemed as necessary as the family spiritual guide, the one prescribes for the fortuity and the other for the present life," (৩২)

সূত্রনির্দেশ

১. Returns relating to publications in the Bengali language in 1857, by Rev. James Long. Calcutta, 1859, p. xx

২. Early Bengali literature and news paper (In the Calcutta Review, 1850, vol 13, P-153.)

৩. Hindoo Astrology, Hindoo Almanac for 1825 [In the Friend of India (Qr. series), 1825, No 13, Oct, P-203-204]

৪. Native Almanc for 1835 (In the Friend of India 1825, 2nd April)

৫. Hindoo Astrology, Hindoo Almanac for 1825 [In the Friend of India (Qr series), 1825. No-13, Oct P-203]

৫ (ক). Amount of the writings, religion and the manners of the Hindoos, by W. Ward, Serampur, 1811, vol II, No 315.

৫ (খ). Ibid, P-316-17.

৫ (গ). Ibid, P-331-32.

৬. Native Almanac for 1835 [In the Friend of India 1835, 2nd April]

৬(ক) বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—শ্রীরামপতি ন্যায়রত্ন, দ্বিতীয় ভাগ, হুগলী, ১৮৭৩ ; পৃ ৩৫০-৩৫১

৬ (খ). Early Bengali literature and Newspaper (In the Calcutta Review, 1850, vol 13, P-153).

৭. Hindoo Astrology, Hindoo Almanac for 1825 P-190.

৮. Hindoo Astrology, Hindoo Almanac for 1825 [In the Friend of India (Qr. series), 1825, No-13 Oct, p 196.]

৯. Native Almanac for 1835 (In the Friend of India, 1835 2nd April)

১০. Ibid. ১১. Ibid. ১২. Ibid.

১৩ (ক). Ibid, 1835, 9th April.

১৩ (খ). Hindoo Astrology, Hindoo Almanac for 1825 [in the Friend of India (Qr. series) 1825, No-13, Oct. P-201.]

১৪. Native Almanac for the present year (ie. 1835), 1835, 9th April.

১৫. Ibid.

১৬. Hindoo Astrology, Hindoo Almanac for 1825 [In the Friend of India (Qr. series) 1825, No-13 Oct P-199]

১৭. Ibid, P-201. ১৮. Ibid P-202 (foot note) ১৯. Ibid.

২০. Returns relating to publications in the Bengali language in 1857, by Rev. James Long, Calcutta 1859 p-XX

২১. Christian Almanac for 1849, in the Bengali language (In the Friend of India, 1848, 21st December.)

২২. Ibid.

২৩. ১৮৫১ সালের খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা (সত্যপ্রদীপ ১৮৫১, ১১ জানুয়ারী)

২৪. Returns relating to publications in the Bengali language in 1857, by Rev. James Long, Calcutta 1859 p-XXI

২৫. Ibid ২৬. Ibid

২৭. বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজ প্রকাশিত বিবিধ ব্যবহারোপযোগী বিষয় সম্বলিত নূতন পঞ্জিকা, শকাব্দ ১৭৭৭, সন ১২৬২ সাল, ইংরাজী ১৮৫৫-৫৬ কলিকাতা সত্যার্ণব মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত।

২৮. নূতন পঞ্জিকা, শকাব্দ ১৭৭৮, সন ১২৬৩, সম্বৎ ১৯১৩, ইং ১৮৫৬-৫৭

২৯. (The list of books published in the Bengali lib.) The Calcutta Gazette, 1896, Appendix—4, 30th December.

৩০. Ibid, 1898 (January)—Appendix-1

৩১. Hindoo Astrology, Hindoo Almanac for 1825 [In the Friend of India (Qr. series) 1825, No-13, Oct p. 205-206].

৩২. Ibid, p. 206-207.

পরিশিষ্ট

(১)

বিবাহের ব্যবস্থা

কন্যার বিবাহ যুগ্ম বর্ষে দেওয়া নয়।
যুগ্মেতে বিধবা হয় ধর্মশাস্ত্রে কয়॥
অযুগ্মে দুর্ভাগ্যবতী বিবাহ না হয়।
গর্ভমাস ধরে কিন্তু বিচার নির্ণয়॥
গর্ভমাস লয়ে তবে বিচার করিবে।
অযুগ্ম বর্ষে কন্যা দান দিবে॥
ধনপুত্রবতী সতী হবে সীমন্তিনী।
চিরকাল যাবে সুখে হয়্যা যশঃস্বিনী॥
কন্যার বিবাহ কিন্তু জন্ম মাসে উক্ত।
সুপ্রসূতি শীঘ্র হয় সুলক্ষণ যুক্ত॥
পুরুষের বিবাহের শুনহ কথন
জন্ম মাস জন্ম দিনে নহে কদাচন॥

বিবাহের বার নিয়ম

শুক্র বুধ সোমবার আর বৃহস্পতি
বিবাহ করিলে নারী হয় পুত্রবতী।
রবি শনি মঙ্গলে কুলটা দোষ নাই।
কিন্তু রাত্রি কর্ম মাত্রে বার দোষ নাই।
বিশেষতঃ রবি শনি মঙ্গল বাসরে।
রাত্রি কৃত বার দোষ কভু নাহি ধরে॥

[সূত্র —নূতন পঞ্জিকা—শকাব্দ ১৭৭৯, সন ১২৬৪, ইং ১৮৫৭-৫৮, পৃঃ ৩৯]

(২)

বিদ্যারম্ভ—

পঞ্চম বৎসরে হয় বিদ্যারম্ভ যুক্ত।
শ্রীহরি শয়ন ভিন্ন উত্তায়ণে উক্ত"
শুক্লপক্ষ হয় আর শ্রেষ্ঠ গুরুবার।
ষষ্ঠী রিক্তা অনধ্যায় ভিন্ন তিথি আর।
অনধ্যায় ভিন্ন দিনে পুষ্যা হস্তা স্বাতি।
পুনর্বসু, অশ্বিনী ভরনী বা রেবতী।
শতভিষা মৃগশিরা শ্রবণা ধনিষ্ঠা।
পূর্ব ভাদ্রপদ মঘা নহেত অনিষ্টা।

পূর্বাষাঢ়া চিত্রা পূর্ব ফাল্গুনী কৃত্তিকা।
বিদ্যারম্ভ উক্ত বটে অশ্লেষা বিশাখা॥
একয় নক্ষত্র বিদ্যারম্ভেতে উত্তম।
রবি শুক্রবার মাত্র গণ্য যে মধ্যম॥
এইরূপ বিদ্যারম্ভ যে দিন করিবে।
পরদিন প্রত্যারম্ভ অবশ্য দেখিবে॥
কদাচিৎ তাহে যদি ইষ্ট নাহি হয়।
গলগ্রহ দিন তবে গর্গ আদি কয়॥

[সূত্র—নূতন পঞ্জিকা, শকাব্দ ১৭৭৯, সন ১২৬৪, ইং ১৮৫৭-৫৮, পৃঃ ৫০]

(৩)

দিনের নাম—

বাঙ্গালা	মুসলমানী	ইংরাজী
রবিবার	এতবার / এতশুম্বা	সণ্ডে
সোমবার	পীর / দে শুম্বা	মণ্ডে
মঙ্গলবার	মঙ্গল / সে শুম্বা	টুইসডে
বুধবার	বুধ / চাহার শুম্বা	ওয়েডনেস্ ডে
বৃহস্পতিবার	জুম্মারাত	থার্সডে
শুক্রবার	জুম্মা	ফ্রাইডে
শনিবার	শনিচর / শুম্বা বা হফ্‌তা	সেটর ডে

মুসলমানের চাঁদ নিরূপণ—

১ মহরম ২ সফর ৩ রবিয়ল আউয়ল ৪ রবিয়স সানি
৫ জমদিয়ল আউয়ল ৬ জমদিয়স সানি ৭ রজব ৮ শাবান
৯ রমজান ১০ সওয়াল ১১ জেলকদ্ ১২ জেলহর্জ্জ।

মহরম ভাহের চাঁদ ১৩ দিনে খানা।
সফর তেজির চাঁদ তেরোদিনে মানা॥
রবিয়ল আউয়ল রোফাতের চাঁদ ১২ দিনে বাতি।
রমজানেতে ৪ চাঁদ করিবেক সাদি॥
শাবান সোফরাতে চাঁদ ১৪ দিনে বাতি।
তারপর ১৫ দিনে করিবেক সাদি॥

রমজানেতে রোজা ধর সওয়ালেতে ঈদ্।
জেলকদেতে কাম নাই জেল হজ্জে বক্‌রিদ॥

[সূত্র—নূতন পঞ্জিকা, সন ১২৬৭, ইং ১৮৬০-৬১, পৃঃ ৭০]

(৪)

নানা দেশীয় বৎসর ও দিন নিদর্শন—

…বঙ্গাব্দ ও চট্টগ্রামে প্রচলিত মগী সৌর মানে গৃহীত হয়, আর হিন্দুস্তানে প্রচলিত সম্বৎ ও ফসলী গৌণ চন্দ্রমানে গৃহীত হয়। কিন্তু ফসলী গৌণ চন্দ্র অতএব কৃষ্ণপ্রতিপাদে মাস আরম্ভ পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়, সম্বৎ মুখ্য চান্দ্রে গণিত হয়, অতএব শুক্লা প্রতিপদে আরম্ভ ও অমাবস্যায় সমাপ্ত হয়, আর উড়িষ্যায় প্রচলিত বিলায়তি সৌরমানে গণিতে হয়। কিন্তু সংক্রান্তির সঞ্চার দিনের পূর্ব দিনে মাস সমাপ্ত হয়, মুসলমানদিগের ব্যবহারিক হিজরী সাল মুখ্য চান্দ্রে মানে হয় কিন্তু অমাবস্যার পর সন্ধ্যার যে দিবস চন্দ্র দর্শন হয় যে দিন মাস সমাপ্ত পরদিনাবধি পরমাস গৃহীত হয়। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ এবং মগী বৎসর পরিবর্ত হয়, আর চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে সম্বৎ পরিবর্ত হয়, এবং ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশীতে বিলায়তি ও ভাদ্রকৃষ্ণ প্রতিপদে ফসলী সাল পরিবর্ত হয়, পরন্তু ঐ দ্বাদশীর পর সংক্রান্তি অবধি বিলায়তির পর বৎসরীয় মাস ব্যবহার হয়। হিজরী বৎসর পরিবর্তের নিয়ম এই যে ১২ চন্দ্রোদয় বৎসর সমাপ্ত হইয়া নূতন বৎসরারম্ভ হয়। ইষবীয় অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় বৎসর ডিসেম্বরে সমাপ্ত হইয়া প্রথম জানুয়ারীতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। এই যে ৮ প্রকার বৎসরের মধ্যে দিন পঞ্জিকার বঙ্গাব্দের প্রতিদিনে ইংলণ্ডীয় বৎসরের দিন, এবং হিজরী বৎসরীয় দিনে ঐক্য করিয়া লিখিত হইবেক আর হিন্দুস্তানের প্রচলিত ফসলী ঐ মাসের নাম দিন পঞ্জিকার শিরোভাগে লিখিত হইবেক……।

[সূত্র—নূতন পঞ্জিকা, সন ১২৬৭,: ইং ১৮৬০-৬১, পৃঃ ৭৪]

(৫)

মুসলমান দিগের নিয়ম—

১.	মহরম—	৩০ দিন	৭.	রজব—	৩০ দিন
২.	সফর—	২৯ ,,	৮.	শাবান—	২৯ ,,
৩.	রবি উলাউন	৩০ ,,	৯.	রমজান	৩০ ,,
৪.	রবি উসসানি—	২৯ ,,	১০.	শওয়াল—	২৯ ,,
৫.	জমাদী উলাবুন—	৩০ ,,	১১.	জীলকদ—	৩০ ,,
৬.	জমাদী উসসানী—	২৯ ,,	১২.	জীলহজ্জ—	২৯ ,,

এইবার মাসে ৩৫৪ দিন। পরন্তু জীলহজ্জ কখনও কখনও মলমাস হয়, তাহা হইলে ঐ মাসে ৩০ দিন এবং বৎসরে ৩৫৫ দিন বৎসর গণিত হয়। তাহার নিয়ম এই যথা, হিজরী সনকে ৩০ দিয়া হরণ করিলে যদি ২, ৫, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৮, ২১, ২৪, ২৬, বা ২৯ অবশিষ্ট থাকে তবে সে বৎসরের জীলহজ্জ মলমাস হয়। হিজরী অর্থাৎ মুসলমানী সাল ইংরাজী এবং বাঙ্গলা বৎসরাপেক্ষা ১০।১১ দিবস ন্যূন হওয়াতে, এই দুই সর্গের যে প্রকার পরস্পরগত নিত্য মেল হয়, সেই প্রকার মেল তাহার সহিত থাকিতে পারে না, ফলতঃ হিজরী সনের মাস-সকল ক্রমে ক্রমে সরিয়া যায়, তাহাতে মহরমাদি প্রত্যেক মাস কখন কখন শীত কালে কখনও বা গ্রীষ্ম কালে পড়ে।

[সূত্র—নূতন পঞ্জিকা, সন ১২৬৭, ইং ১৮৬০-৬১, পৃঃ ১৪৭]

(৬)

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের টেরম ও সিটিং এবং সেশনের নিরূপিত সময়—

প্রথম টেরম	৭ জানুআরী	৩ ফেব্রুয়ারী
দ্বিতীয় ,,	১লা মার্চ	২৯ মার্চ
তৃতীয় ,,	১৫ই জুন	১২ই জুলাই
চতুর্থ ,,	২২ অক্টোবর	১২ নভেম্বর
প্রথম সিটিং	৪ ফেব্রুআরী	১৭ ফেব্রুআরী
দ্বিতীয় ,,	২৯ মার্চ	১১ এপ্রিল
তৃতীয় ,,	১৩ জুলাই	২৬ জুলাই
চতুর্থ ,,	১৯ নভেম্বর	২ ডিসেম্বর

প্রথম সেশন	৭ জানুআরি
দ্বিতীয় ,,	১ মার্চ
তৃতীয় ,,	২৪ এপ্রিল
চতুর্থ ,,	১৫ জুন
পঞ্চম ,,	১০ আগষ্ট
ষষ্ঠ ,,	১২ অক্টোবর
সপ্তম ,,	৪ ডিসেম্বর

এই সকল তারিখের মধ্যে কোনো দিন যদি রবিবার হয়, তবে টেরম কিম্বা সিটিং অথবা সেশনের কর্ম আরম্ভ হয়। প্রতি টেরম ২৮ দিন ও সিটিং ১৪ দিন হয়। এই দুই সময় দেওয়ানী মোকর্দমা বিচার হয়, তাহার মধ্যে সিটিঙ্গের সময় নূতন মোকর্দমা হয় না। টেরমে যে সমস্ত মোকর্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহারই বিশেষ বিবেচনা হয়। সেশনে ফৌজদারী মোকর্দমা হয় তাহার শেষ

দিনের স্থির নাই মোকর্দমার শেষে তাহার শেষ হয়। সেশনের পরে পুনর্বার টেরম্ আরম্ভ হইবার পূর্বে যতদিন থাকে, তাহাকে বকেষণ কহে, ইহাতেও কখনও অধিক মোকর্দমা থাকিলে তাহার বিচার হয়, কিন্তু সর্বদা বকেষণে জজ সাহেবরা প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার চেম্বর (অর্থাৎ আপনাদের ঘরে) বৈঠক করিয়া আদালতে বিশেষ কর্ম উৎপত্তি হইলে নিষ্পত্তি করেন।

[সূত্র—নূতন পঞ্জিকা—সন ১২৬৭, ইং ১৮৬০-৬১, পৃঃ ২৫৫]

(৭)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির গাড়ীর ভাড়া ও সময়ের নিরূপণ এবং নিয়মাদি।

গমনাকাঙ্ক্ষী লোকরা যেন নিরাশ না হয়েন এই নিমিত্তে তাহাদিগকে গাড়ী চড়িবার নিরূপিত সময়ে অভাবত ১০ মিনিট পূর্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হইবে।

লিখিত নিরূপিত ক্ষণে গাড়ি পহুঁছুনের যদি কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হয় তজ্জন্য রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী হইবেন না, ফলতঃ নিয়মরক্ষণে তাঁহারা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে কোনোক্রমে ত্রুটি করিবেন না।

ডবল জার্নি অর্থাৎ একমাত্র টিকিটে গমন ও আগমন দুই কার্য সম্পন্ন হইতে পারে এমত যে রিটারণ টিকিট তাহা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে দেওয়া যাইবেক। এক টিকিটে গমন ও অন্য টিকিটে প্রত্যাগমন করিতে হইলে দুই টিকিটের মূল্য যত হয় রিটরণ টিকিট তার তিন অংশের এক অংশ-মূল্য মূল্যে পাওয়া যাইবেক। রিটরণ টিকিটে সেই দিন বা সেই গাড়ী শ্রেণী ভিন্ন অন্য দিন আসিতে পারিবেন না। কিন্তু শনিবার রিটরণ টিকিট লইলে সোমবার সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত যে কোন গাড়ি শ্রেণীতে হউক আসিতে পারিবেন।

১২ মাসের অনধিক বয়স্ক শিশুর ভাড়া লাগিবেক না। এবং দ্বাদশ বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকের অর্ধেক ভাড়া লাগিবেক।

[সূত্র নূতন পঞ্জিকা—সন ১২৬৭, ইং ১৮৬০-৬১, পৃঃ ২৫৬]

(৮)

বৎসরাদি বিশেষ বিশেষ কাল নিরূপণের বিষয়

পরমেশ্বরের উল্লেখিত নিয়মানুসারে জগৎ সৃষ্টি অবধি তাবৎ দেশীয় লোকেরা সূর্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ দ্বারায় কালাদি গণনা করিয়া আসিতেছে, যথা, সূর্যের প্রাত্যহিক চক্রগতি দ্বারা দিবারাত্রি সদা সর্বত্র গণনা করা গিয়াছে। য়িহুদী

এবং প্রাচীন য়ুনানী এবং রুমানি ইত্যাদি পূর্বকালীন লোকেরা চন্দ্রের গতি নিরীক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারায় মাস ও বৎসরাদি বিশেষ বিশেষ কাল নির্ণয় করিত, এবং আধুনিক য়িহুদী ও মুসলমান প্রভৃতি কোন কোন জাতীয়েরা ঐ রূপে চান্দ্রযান অদ্য পর্য্যন্তও ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু ইংরাজী আর হিন্দুগণ ইত্যাদি অন্যান্য সভ্য দেশস্থ লোকেরা জোতির্বিদ্যা কৌশলক্রমে সূর্যের বার্ষিক চক্রগতি নির্ণয় করাতে, প্রায় তদ্দ্বারাই দিবস ও মাস ও ঋতু বৎসরাদি তাবৎ প্রকার কাল গণনা করিয়া থাকেন। অতএব চন্দ্রমান ও সৌরমান এই দুই গণনা ক্রমদ্বারা প্রায় সর্বদেশীয় লোকেরা কাল সকল নির্ণয় করেন। অধিকন্তু নক্ষত্রগণের গতিক্রম নির্ণিত যে নক্ষত্রমান, তাহাও বিশেষ বিশেষ কার্যোপলক্ষে জ্যোতির্বেত্তৃগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১ পৃঃ ১৩-১৪]

(৯)

দিনের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ণয়করণের নিয়ম।

ইংরাজী ধারা এই। এক দিবারাত্রিতে ২৪ ঘণ্টা হয়, ১ ঘণ্টায় ৬০ মিনিট, এবং ১ মিনিটে ৬০ সেকেণ্ড হয়। দুই প্রহর রাত্রি অবধি ঘণ্টার গণনারম্ভ করা যায়। তাহাতে মধ্যাহ্নকালীন দুই প্রহর পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা গণনা করিলে, পুনরায় গণনা আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এক ঘণ্টা অবধি ধরিয়া ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ঠিক না দিয়া কেবল ১২ ঘণ্টা (অর্থাৎ দুই প্রহর) পর্যন্ত প্রতিদিন দ্বিবার গণনা করিতে হয়। এতদ্দেশীয় গণনা অনুসারে সূর্যের উদয় অবধি অস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন ৪ প্রহর, এবং অস্তাবিধি উদয় পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতেও ৪ প্রহর হয়। সুতরাং এক অহোরাত্রে ৮ প্রহর (কিংবা ৬০ দণ্ড) হয়। ৪ প্রহরেতে ৩০ দণ্ড, ১ প্রহরে ৭½ দণ্ড, ১ দণ্ডে ৬০ পল, ১পলে ৬০ বিপল এবং ১ বিপলে ৬০ অনুপল।

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১, পৃঃ ১৫-১৬]

(১০)

দিনারম্ভ নির্ণয় করণ

ইংরাজী লোকেরা দুই প্রহর রাত্রি অবধি অপর দুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত, এবং হিন্দুরা সূর্যের এক উদয় অবধি অপর উদয় পর্যন্ত ও মুসলমানেরা সূর্যের এক অস্ত অবধি অপর অস্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন জাতিয়েরা এই তিন প্রকারে প্রতি দিবসের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। যথা, সপ্তাহের প্রথম দিবসের আরম্ভ মুসলমানেরা

সন্ধ্যাকালাবধি, আর ইংরেজরা শনিবারের দুই প্রহর রাত্রি সময়াবধি, এবং হিন্দুগণ রবিবারের প্রাতঃ কালাবধি গণনা করেন।

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১, পৃঃ ১৭-১৮]

(১১)

সাবান ও চান্দ্র দিনাদির বিষয়

হিন্দুদের শাস্ত্রানুসারে সূর্যের এক উদয় অবধি অপর উদয় পর্যন্ত যে দিন, তাহাকে সাবান দিন কহা যায়। যে কোনদিন অবধি ঐরূপ ৩০ সাবান দিনে ১ সাবান মাস হয়। ১২ সাবান মাসে এক সাবান বৎসর হয়। তাহাতে সাবান বৎসরে কেবল ৩৬০ দিন মাত্র থাকে। কিন্তু প্রতি সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপল হয়।

চান্দ্রমাসে ৩০ তিথি অর্থাৎ চান্দ্র দিন হয়। যে ১৫ তিথিতে চন্দ্রের জ্যোৎস্না ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহাকে শুক্লপক্ষ এবং যে ১৫ তিথিতে জ্যোৎস্না উত্তরোত্তর হ্রাস পায় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ কহা যায়।

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা ১৮৫১, পৃঃ ১৮-১৯]

(১২)

বাঙ্গালা মাস

প্রতি বৎসরের বাঙ্গালা ১২ সৌর মাস হয় বটে, অথচ প্রত্যেক মাসের দিন-সংখ্যা সকল বৎসরের সমান নহে; তাহার কারণ এই, সূর্যের গতির শীঘ্রতা ও মন্দতা প্রযুক্ত মাস সকলের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তাহাতে কখন মাসে ২৯ কখন বা ৩২ দিন হয়। অতএব মাস সকলের নাম এবং সিদ্ধান্ত রহস্য মতে তৎপরিমাণ এস্থানে লেখা যাইতেছে।

	মাস	দিন	দণ্ড	পল
১	বৈশাখ	৩০	৫৬	৪৯
২	জ্যৈষ্ঠ	৩১	২৫	৪১
৩	আষাঢ়	৩১	৩৮	৪০
৪	শ্রাবণ	৩১	২৭	৫৯
৫	ভাদ্র	৩১	০	২০
৬	আশ্বিন	৩০	২৫	৪১
৭	কার্তিক	২৯	৫২	৫১
৮	অগ্রহায়ণ	২৯	২৮	৫৮

	মাস	দিন	দণ্ড	পল
৯	পৌষ	২৯	১৯	৫
১০	মাঘ	২৯	২৭	২১
১১	ফাল্গুন	২৯	৫০	৪
১২	চৈত্র	৩০	২২	৩
	সবশুদ্ধ—	৩৬৫	১৫	৩২

এই ১২ মাসে সূর্য দ্বাদশ রাশি ভোগ করে; ফলতঃ প্রত্যেক রাশিতে সূর্য যতকাল থাকে, সেই কালে এক এক সৌর মাস হয়। যথা,

১.	মেষে	থাকিলে	বৈশাখ
২.	বৃষে	,,	জ্যৈষ্ঠ
৩.	মিথুনে	,,	আষাঢ়
৪.	কর্কটে	,,	শ্রাবণ
৫.	সিংহে	,,	ভাদ্র
৬.	কন্যাতে	,,	আশ্বিন
৭.	তুলায়	,,	কার্তিক
৮.	বৃশ্চিকে	,,	অগ্রহায়ণ
৯.	ধনুতে	,,	পৌষ
১০.	মকরে	,,	মাঘ
১১.	কুম্ভে	,,	ফাল্গুন
১২.	মীনে	,,	চৈত্র

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১, পৃঃ ২০-২২]

(১৩)

ইংরাজী মাসের ১১ তারিখ অবধি ১৭ তারিখের মধ্যে বাঙ্গালা মাস প্রবর্ত্ত হয়; যথা—

১ বৈশ	=	১২/১৩ এপ্রিল	১ কার্ত্ত	=	১৬/১৭ অক্টবর
১ জ্যৈষ্ঠ	=	১৩/১৪ মে	১ অগ্রহ	=	১৫/১৬ নভেম্বর
১ আষা	=	১৩/১৪ জুন	১ পৌষ	=	১৪/১৫ ডিসেম্বর
১ শ্রাব	=	১৫/১৬ জুলাই	১ মাঘ	=	১২/১৩ জানুয়ারী
১ ভাদ্র	=	১৫/১৬ আগষ্ট	১ ফাল্গু	=	১২/১৩ ফেব্রুয়ারী
১ আশি	=	১৬/১৭ সেপ্টেম্বর	১ চৈত্র	—	১২/১৩ মার্চ

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১, পৃঃ ২২]

মন্তব্য ॥ বর্তমানে উক্ত তারিখের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ১ লা বৈশাখের দিকে লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। বর্তমানে উক্ত দিন ইংরাজীর ১৫ই এপ্রিল হয়ে থাকে।

(১৪)

১৮৫১ সালের গ্রহণ

এই বৎসরে (৪) চারি গ্রহণ হইবে অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ (২) দুই ও চন্দ্রগ্রহণ দুই। কিন্তু ইহার মধ্যে ২ সূর্য্যগ্রহণ ও ১ এক চন্দ্রগ্রহণ তাবদ্ভারতবর্ষে দৃশ্য হইবে না।

১. জানুয়ারী মাসের ১৭ তারিখ অসম্পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হইবে।

আরম্ভ প ৯ঘ ৩৪ মি।
মধ্যকাল প ১০ঘ ৪৪ মি।
মোক্ষ প ১১ঘ ৫৪ মি।

এই গ্রহণের মধ্যকালে প্রায় অর্ধচন্দ্র আচ্ছাদিত হইয়া এতদ্দেশে দৃশ্য হইবে।

২. ফেব্রুয়ারী ১ তাং অঙ্গুরীয়াকৃতি সূর্যগ্রহণ হইবে। কিন্তু এতদ্দেশে অদৃশ্য। এই গ্রহণ অগ্রে মোজাম্বিক চানলেতে প ৮ঘ ৫৮ মি দেখা যাইবে, এবং সর্বশেষে অস্ট্রেলিয়া দেশে প ২ঘ ৩৯ মি।

৩. জুলাই মাসের ১৩ তাং অসম্পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হইবে কিন্তু এতদ্দেশে অদৃশ্য।

৪. জুলাই মাসের ২৮ তাং সর্বগ্রাস সূর্যগ্রহণ হইবে কিন্তু এতদ্দেশে অদৃশ্য। এই গ্রহণ প্রথমত উত্তর আমেরিকা দেশে প ৬ঘ ৮ মি এবং মিশর দেশে প ১০ঘ ৪৫ মি দৃশ্য হইবে।

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১, পৃঃ ৩৭]

(১৫)

নিম্নলিখিত পর্বদিন যাহাতে অফিসাদি বন্ধ হয় :

হিন্দুদিগের পর্ব

শ্রী পঞ্চমী — ৬, ৭ ফেব্রুয়ারী — ২৫, ২৬ মাঘ – বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২ দিন
শিবরাত্রি — ১, ২ মার্চ — ১৮, ১৯ ফাল্গুন—শনি, রবিবার ২ দিন
দোলযাত্রা — ১৬, ১৭, ১৮ মার্চ — ৪, ৫, ৬, চৈত্র—রবি, সোম, মঙ্গলবার ৩ দিন
বারুণী — ২৯, ৩০ মার্চ — ১৭, ১৮ চৈত্র—শনিবার, রবিবার ২ দিন
শ্রীরামনবমী — ১০, ১১ এপ্রিল — ২৯, ৩০ চৈত্র বৃহস্পতি, শুক্রবার ২ দিন

চড়কপূজা — ১২, ১৩ এপ্রিল — ৩১ চৈত্র, ১লা বৈশাখ—শনি, রবিবার ২ দিন
দশহরা — ৮ জুন — ২৬ জ্যৈষ্ঠ—রবিবার ১ দিন
স্নানযাত্রা — ১৩ জুন — ৩১ জ্যৈষ্ঠ—শুক্রবার ১ দিন
রথযাত্রা — ১ জুলাই — ১৮ আষাঢ়—মঙ্গলবার ১ দিন
পূর্ণযাত্রা — ৯ জুলাই — ২৬ আষাঢ়—বুধবার ১ দিন
রাখী পূর্ণিমা — ১১ আগষ্ট — ২৭ শ্রাবণ—সোমবার ১ দিন
জন্মাষ্টমী — ২০, ২১ আগষ্ট — ৫, ৬ ভাদ্র—বুধ, বৃহস্পতিবার ২ দিন
মহালয়া — ২৪ সেপ্টেম্বর — ৯ আশ্বিন—বুধবার ১ দিন
দুর্গোৎসব — ২৮ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর — ১০-২০ আশ্বিন—রবিবার-রবিবার ৮ দিন
লক্ষ্মীপূজা — ৯, ১০ অক্টোবর — ২৪, ২৫ আশ্বিন—বৃহস্পতি, শুক্রবার ২ দিন
শ্যামাপূজা — ২৪, ২৫ অক্টোবর — ৮, ৯ কার্তিক—শুক্র, শনিবার ২ দিন
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া — ২৬ অক্টোবর — ১০ কার্তিক—রবিবার ১ দিন
জগদ্ধাত্রীপূজা — ২, ৩ নোবেম্বর — ১৭, ১৮ কার্তিক—রবি, সোবার ২ দিন
কার্তিক পূজা — ১৫, ১৬ নোবেম্বর — ৩০ কার্তিক শনিবার-১লা অগ্রহায়ণ রবিবার ২ দিন

মুসলমানীয় পর্বদিন

সব্ ই বরাৎ	১৫ জুন	রবিবার	১ দিন
রমজান্	২-৩০ জুলাই	বুধবার-বুধবার	২৯ দিন
ঈদ	৩১ জুলাই	বৃহস্পতিবার	১ দিন
বকর ঈদ	৭ অক্টোবর	মঙ্গলবার	১ দিন
মহরম	২৬ অক্টো-৫ নোবেম্বর	রবি-বুধবার	১১ দিন

ইংরাজী বন্ধদিন

নিউ ইয়ারস্ ডে	(বৎসরারম্ভ)	১ জানুয়ারী	১৮ পৌষ বুধবার
গুড্ ফ্রাইডে	(খ্রীষ্টের মরণ দিন)	১৮ এপ্রিল	৬ বৈশাখ শুক্রবার
কুইনস্ বার্থডে	(ভিক্টোরিয়া রাণীর জন্মদিন)	২৪ মে	১১ জ্যৈষ্ঠ শনিবার
ক্রিস্মাস্ ডে	(খ্রীষ্টের জন্মদিন)	২৬ ডিসেম্বর	১১ পৌষ বৃহস্পতিবার

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১, পৃঃ ৬২-৬৩]

(১৬)

সমস্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা :

পৃথিবীর খণ্ড		নিবাসী
ইউরোপ	চব্বিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ	২৪,৪০,০০,০০০
এশিয়া	ষাইট কোটি	৬০,০০,০০,০০০
আফ্রিকা	সাত কোটি	৭,০০,০০,০০০
আমেরিকা	চার কোটি চল্লিশ লক্ষ	৪,৪০,০০,০০০
অষ্ট্রালেশিয়া ও পলিনীশিয়া	দেড় কোটি	১,৫০,০০,০০০
সর্বশুদ্ধ সাতানব্বই কোটি ত্রিশ লক্ষ		৯৭,৩০,০০,০০০

বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা :

খ্রীষ্টীয়ান	ত্রিশ কোটি	৩০,০০,০০,০০০
য়িহুদী	চল্লিশ লক্ষ	৪০,০০,০০০
মুসলমান	দশ কোটি	১০,০০,০০,০০০
হিন্দু	বার কোটি চল্লিশ লক্ষ	১২,৪০,০০,০০০
পারসী, শীক্, ইত্যাদি অন্যান্য মতাবলম্বী	সাড়ে চৌদ্দ কোটি	১৪,৫০,০০,০০
সর্ব্বশুদ্ধ সাতানব্বই কোটি ত্রিশলক্ষ		৯৭,৩০,০০,০০

[সূত্র—খ্রীষ্টান পঞ্জিকা, ১৮৫১, পৃঃ ৬৬]

[এ প্রবন্ধের প্রাচীন বানান ও অন্যান্য পরিভাষা, উচ্চারণগত শব্দবিন্যাসগুলি মূলানুগ, অবিকৃত ও অসংস্কৃত রাখা হ'ল। মূল লেখা ও পরিশিষ্টে চলতি ও সাধুভাষা প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত—সম্পাদক]

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবনে টেলিভিশনের অভিঘাত

কেতকী কুশারী ডাইসন

১

কিছু ব্যক্তিগত কথা দিয়ে এই আলোচনাটি শুরু করতে বাধ্য হচ্ছি। কেন, তা একটু পরেই প্রতিভাত হবে।

ব্রিটেনে সংসার পাতার পর বহু বছর যাবৎই টেলিভিশন খরিদ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। যতদিন ছেলেরা আসে নি ততদিন কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। পিছনে তাকিয়ে এখন বুঝতে পারি যে, ছেলেদের বয়স যখন ছিলো তিন-চার সে-সময়ে এই সমাজে, যেখানে ঘরের কাজে বা ছেলে-ভোলানোর ব্যাপারে বাইরের সাহায্য পাওয়া দুষ্কর, টেলিভিশন নামক যন্ত্রটির কাছ থেকে আমি কিছু মূল্যবান সাহায্য পেতে পারতাম। ঐ বয়সের শিশুদের জন্য বি-বি-সি টেলিভিশন ভারি সুন্দর-সুন্দর অনুষ্ঠান করে। শিশুদের ঐ সব অনুষ্ঠানের সামনে বসিয়ে দিয়ে মা তাঁর হাতের কাজ খানিকটা এগিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সে-সময়ে আমরা টেলিভিশন কিনি নি; হয়তো সেটা বোকামিই হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে ছেলেরা যখন নার্সারি স্কুল ছেড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করলো তখন তারা ঘরে আনতে লাগলো তাদের সমাজের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান টেলিভিশন-সম্পর্কে জরুরি যত খবর। কিছু দিনের মধ্যেই সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারা বুঝে গেলো যে, টেলিভিশন-নামক বস্তুটির মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার রকমের হুল্লোড়। তাদের খেয়াল হলো যে, ক্লাসের আলাপ-আলোচনার একটি প্রধান বিষয়বস্তুই টেলিভিশনে দেখা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, এবং তাদের বাড়িতে একটি সেট না থাকায় ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করার আনন্দ থেকে তারা নিদারুণভাবে বঞ্চিত। এই উপলব্ধি সব থেকে বেশি মর্মাহত করলো আমাদের বড় ছেলেকে; টেলিভিশনের অভাবটা সে অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করলো, এবং আমরা তাকে কিভাবে বঞ্চিত করছি সে-সম্বন্ধে নিত্য গীত গাইতে লাগলো। রোজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সে কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি যাবেই যাবে, টেলিভিশন দেখতে। যেতোও। না যেতে দিলে মেঝেতে শুয়ে কাতর কান্না: 'সকলের টেলিভিশন আছে, শুধু আমাদের নেই।' প্রায় রোজই

তাকে দেখা যেতো অন্যের দোরে কড়া নাড়তে। সঙ্গে যেতো ছোটজনও। দাদা পাশের বাড়ি গেলে কোন্ ছোট ভাই সঙ্গে যেতে না চাইবে? এরকমভাবে কিছু-দিন চলার পর আমাদের অগত্যা আপস করতে হোলো। সৌভাগ্যক্রমে মাত্র বিশ পাউণ্ডে একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড টেলিভিশনের অধিকারী হয়ে গেলাম আমরা, এবং বাড়িতেও খানিকটা শান্তি এলো।

সেই সেটটি এখনও বিকল হয়নি, দিব্যি চলছে, এবং আমাদের পারিবারিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তার প্রভাব, তজ্জনিত লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখবার সময়ও এসে গেছে।

এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, আজকের যন্ত্রশিল্পনির্ভর সমাজগুলিতে টেলিভিশন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের কোঠায় উন্নীত এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। তথাকথিত অনগ্রসর দেশগুলিতেও তার প্রভাব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। টেলিভিশন থেকে নাগরিকেরা আহরণ করে তাদের প্রমোদ, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে খবরাখবর, সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডারে নানান অনুপুঙ্খ, একাধিক ঘরোয়া সমস্যার সমাধানপদ্ধতি, বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের মতামত, এবং জীবনের নানান ব্যাপারে গ্রহণীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ইডিওলজির বিকিরণ যেসব দেশে একান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন সমাজবাদী দেশগুলিতে, বা সামরিক একনায়কত্বের অধীন দেশগুলিতে, সেসব দেশে টেলিভিশন রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সোভিয়েত দুনিয়ার বা চীনের টেলিভিশন তাদের সরকারের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখতে পারে না।

এখানে কেউ কেউ স্পষ্ট তর্ক তুলতে পারেন যে, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রে'র টেলিভিশন ব্যবস্থাও, হোক না তা সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, তার সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথিবীকে দেখে। নিশ্চয়ই দেখে, কিন্তু গণতন্ত্র যেহেতু চিন্তার স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে বিশেষ মূল্য দেয়, সেহেতু একটা প্রাথমিক উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতাও তার সামাজিক দৃষ্টিকোণেরই অন্তর্গত। অতিকায় মতৈক্য ও মতবৈচিত্র্য, এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ অবশ্যই আছে। কেউ যদি বলেন, 'এটা আমার মত; অমুক মুনি একথা বলে গেছেন, এবং তাঁর প্রতিটি কথা অভ্রান্ত; এটা শাশ্বত নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত; যে আমার মতের বিরুদ্ধে সে সন্দেহজনক ও বিপজ্জনক ব্যক্তি,' তাহলে শ্রোতার মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু কেউ যদি বলেন 'এটা আমার মত; অমুক মুনি অবশ্য অমুক কথা বলে গেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই, এই এই কারণে; এ বিষয়ে আপনার কি মত?'

তাহলে আমরা উৎসুক হয়ে বক্তার দিকে তাকাই এবং স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করি। মুক্ত দুনিয়ার টেলিভিশন সম্পর্কে এটা মানতেই হয় যে, তা আলোচনাপ্রিয়, যে কোনো বিষয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা তার প্রিয় কাজ; এবং অন্তত আমার তো মনে হয় যে, একদেশদর্শিতা অপেক্ষা বহুমুখী আলোচনার মাধ্যমেই যাথার্থ্যের হদিশ পাওয়া সুকর।

অবশ্য তার মানে মোটেও এ নয় যে, অবাধ স্বাধীনতা বলে মানুষের জীবনে কিছু আছে। নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা, এ দুয়ে মিলেই সামাজিক মানুষ, এবং সে পথেই সভ্যতার অগ্রগতি হয়ে থাকে। তবে ঐ দুই উপাদানের অনুপাত কী হবে তা নিয়ে তর্ক চলছে, চলবে। মুক্ত দুনিয়ার টেলিভিশনেও কোনো কোনো ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। সে আলোচনায় পরে আসছি।

এখানে বলা দরকার যে, টেলিভিশন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা মুখ্যত বি-বি-সি-কে ঘিরে। কদাচিৎ 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেলিভিশন' বা সংক্ষেপে 'আই-টি-ভি'র অনুষ্ঠানও দেখে থাকি। তবে বি-বি-সি-ই বেশি দেখা হয়, কারণ একাধারে মনোজ্ঞ ও মননশীল অনুষ্ঠান বি-বি-সি-ই বেশি পরিবেশন করে থাকে। সুবিধা এই যে, প্রচারমাধ্যম ও শিল্পমাধ্যম হিসাবে বি-বি-সি যথেষ্ট আত্মসচেতন ও বিশ্লেষণপ্রিয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে-বিদেশে টেলিভিশনের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে সর্বদা আগ্রহী এবং বিভিন্ন দেশের টেলিভিশন ব্যবস্থার উপরে তথ্যচিত্র প্রস্তুত করতে ব্যগ্র। এই তথ্যচিত্রগুলির অনেক জায়গা জুড়ে থাকে অন্য দেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠানের অংশ। এভাবে ক্যানাডা, কিউবা, ব্রাজিল, ইস্রায়েল, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশদেশ, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, এমন কি ভারতের টেলিভিশন অনুষ্ঠান থেকেও নানান অংশ দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে।

বি-বি-সি-র একটি অনুষ্ঠান থেকেই জেনেছি যে বিভক্ত বার্লিনে টেলিভিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ। পূর্ব-পশ্চিম দুই বার্লিন পরস্পরের টেলিভিশন মারফৎ পরস্পরের খবরাখবরের ও চিন্তাধারার হদিশ রাখতে পারে। বিশেষত পূর্ব বার্লিনের মানুষের কাছে এর মূল্য প্রভূত, কারণ পশ্চিম সম্পর্কে খাঁটি খবর পাবার আর কোনো পথ তার নেই। পুবের খবর বা বইপত্তর পশ্চিমে ঢুকতে পারে, কিন্তু পশ্চিমের সংবাদপত্র-পুস্তকাদি পুবে ঢুকতে পারে না। বেতার বা টেলিভিশনকে বইপত্রের মত নিষেধের কাঁটাতার দিয়ে আটকে রাখা যায় না। 'মুক্ত দুনিয়া', বিশেষত তাদেরই প্রতিবেশী পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে পূর্ব বার্লিনের নাগরিকদের কৌতূহল স্বাভাবিক বৈ নয়; ফলে তারা যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে পশ্চিম

বার্লিন কর্তৃক প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে এবং তার সাহায্যে 'মুক্ত দুনিয়া' সম্পর্কে নিজেদের ওয়াকিবহাল রাখে।

এও জেনেছি যে, ক্যানাডার ফরাসীভাষী কুইবেক অঞ্চলে ফরাসীভাষাশ্রয়ী টেলিভিশন ফরাসীভাষী ক্যানাডীয়দের জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি-অভিমান ও রাজনৈতিক আত্মসচেতনতাকে বহুগুণ বর্ধিত করেছে এবং ইংরেজীভাষী ক্যানাডীয়-দের থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধকে তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য তাদের দাবিকেও পুষ্ট করেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মাধ্যমে রিলে করা সম্ভব হওয়ায় একই টেলিভিশন অনুষ্ঠান মহাদেশ জুড়ে প্রচারিত হতে পারে। ভারতেও বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইয়োরোপেও বিশেষ কোনো ঘটনা উপলক্ষ্যে এটা করা হয়। যেমন সম্প্রতি পশ্চিমে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে পুবে ইস্রায়েল ও তুরস্ক পর্যন্ত দর্শকেরা 'ইয়োরো-ভিশন'-এর মাধ্যমে একই গীত প্রতিযোগিতা দেখতে পারলো। একই উপায়ে ফরাসী টেলিভিশনের সান্ধ্যসংবাদ পরিবেশন কয়েক ঘণ্টা ধরে ব্রিটেনে নৈশ 'তেলেজুর্নাল' (Te'le'journal) আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বত্রই এক অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হবে। এই নৈকট্যের ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

২

যন্ত্র হিসাবে টেলিভিশন কতগুলি প্রচণ্ড সুবিধার অধিকারী। আকারে সেটি একটি সুইচ-সম্বলিত ছোট সাইজের বাক্স—কথ্য ইংরেজীতে ঠাট্টাচ্ছলে তাকে 'দ্য বক্স' বলে ডাকাও হয়ে থাকে—এবং বেতারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধারণ নাগরিকদের ঘরে ঘরে একবার তার প্রবেশ ঘটলে তার জয় প্রায় অবশ্যম্ভাবী। বেতার যেখানে শুধুমাত্র ধ্বনিনির্ভর, টেলিভিশন সেখানে চোখ এবং কান দুই ইন্দ্রিয়কেই তৃপ্ত করতে সমর্থ। গতিশীল দৃশ্যাবলী এবং ধ্বনির চিত্তাকর্ষক সমন্বয়ে, সংবাদ পরিবেশনের সময় ঘটনাস্থলের সঙ্গে চোখকানের সরাসরি সংযোগ-স্থাপনে তার ঈর্ষণীয় ক্ষমতায়, প্রমোদবিতরণে তার যান্ত্রিক ক্লান্তিহীনতার কৌশলে টেলিভিশন যথার্থই বলতে পারে, 'আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'। প্রথমে দর্শকদের চোখ কানকে, তারপর সামগ্রিক অর্থে তাদের বোধশক্তিকে টেলিভিশন অল্প আয়াসে বশে এনে ফেলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় যে কোনো শহরে কোনো নতুন ছবি মুক্তিলাভ করার পর সিনেমা হলের সামনে মানুষের ভিড়

স্মরণীয়। সাধারণ মানুষ, সে বিত্তশালী দেশের নাগরিকই হোক, আর ছা-পোষা বাঙালীই হোক, কোনো কঠোর আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত না হলে খোঁজে একটু প্রমোদের স্বাদ। সেই প্রমোদের অষ্টপ্রহরব্যাপী উপকরণকে যদি একটি বাক্সের আকারে একেবারে বাড়ির ভিতরেই পাওয়া যায়, সিনেমাহলে দৌড়নোরও প্রয়োজন থাকে না, তাহলে সেটি যে গৃহদেবতার সমান হয়ে উঠবে তা আর বিচিত্র কি? ঠাকুরঘরে ঠাকুরের যে স্থান, পাশ্চাত্য দেশের ঘরে ঘরে টেলিভি-শনেরও প্রায় সে স্থান হয়েছে—সে হয়ে উঠেছে বৈঠকী কামরার 'ফোকাল পয়েন্ট'।

প্রাচ্য অর্থে যৌথ পরিবারপ্রথা পশ্চিম ইয়োরোপে বহুদিন ধরেই বিলুপ্ত, তবে শিল্পবিপ্লবের আগেকার সমাজে বিবাহিত যুবকযুবতীরা বাপমায়ের সঙ্গে এক আস্তানাতে না থাকলেও সাধারণত এক গাঁয়ে বা কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে বাস করতো। ফলে দু-তিন পুরুষের মধ্যে লেনদেনটা বেশি হতে পারতো। বুড়ো-বুড়ীরা নাতিনাতনীদের সঙ্গ বা শেষ জীবনে সেবাটুকু বেশি পেতেন, যুবতী মায়েরা সন্তানপালনে মা বা শাশুড়ীর খানিকটা সাহায্য পেতে পারতেন। সে সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর তো ছিলোই, পাড়াতুতো সম্পর্কগুলোও প্রবল ছিলো,—প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনতো, বিপদেআপদে সাহায্য করতো। এক কথায়, মানুষ আরও বেশি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিলো। শিল্পবিপ্লবোত্তর সভ্যতায় আত্মীয়তার বন্ধন শিথিলতর। বাবা, মা, নাবালক সন্তানদের যে-সমষ্টিকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি' বলে অভিহিত করেন এখন হোলো সেই কোষতুল্য ক্ষুদ্র পরিবারেরই যুগ। অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ছেড়েই দিলাম, কৈশোরের গণ্ডী পেরোনোর পর বাপ-মা ও আপন ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কই শ্লথ হয়ে পড়ে। আর পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো আধুনিক শহুরে জীবনে কতখানি ম্লান হয়ে যায় তা কলকাতার লোকেদেরও অজানা নেই। অথচ প্রকৃতি প্রকৃত ফাঁক পছন্দ করে না, বোধহয় তাই গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন গৃহরূপ বাক্সে বন্দী মানুষের ত্রাণকর্তা হয়ে পড়েছে টেলিভিশন-নামক বাক্সটি। টেলিভিশন নিয়ে নিয়েছে একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক ভূমিকা: বিচ্ছিন্ন মানুষের বিচ্ছিন্নতা-বোধের সঙ্গে অহর্নিশ সংগ্রামের অস্ত্র সে।

পশ্চিমের সব দেশই ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, উত্তর আমেরিকা ইত্যাদির মত যন্ত্রশিল্পনির্ভর ও নগরপ্রধান নয়, তবে সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি সে দিকেই। সর্বত্রই বৃহত্তর পারিবারিক এবং পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো শিথিল

হয়ে পড়ছে এবং কোষ-পরিবারের সত্তা দৃঢ় হচ্ছে। সেই সুযোগে টেলিভিশনের প্রভাবও বেড়ে চলেছে এবং তার ফলাফলও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। ইয়োরোপের একটি অপেক্ষাকৃত 'অনগ্রসর' দেশ স্পেনের জিপ্‌সী পরিবারগুলি বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে 'ফ্ল্যামেংকো' রীতির নৃত্যগীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে ও বিবর্তিত করেছে। এই শিল্পশৈলী মূলত গোষ্ঠীর জীবনজাত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্পেনের জিপ্‌সীরাও নগরসভ্যতা এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পাল্লায় পড়ে তাদের আস্তানা ছেড়ে সরকারী ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানে তারা অন্যান্য শহরবাসীদের মত কোষ-পারিবারিক টেলিভিশন-কেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, ভুলে যাচ্ছে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত নৃত্যগীতের ধারা। টেলিভিশনই যেখানে প্রমোদ জোটাতে ব্যস্ত, সেখানে নিজেদের উঠোনে নেমে নাচার বা গলা ছেড়ে গাওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়? ফ্ল্যামেংকো শিল্পীদের মনে তাই আশঙ্কা যে অন্যান্য অনেক লোকশিল্পের মত ফ্ল্যামেংকোও তার গোষ্ঠী-পরিবেশ হারিয়ে হয়ে পড়বে শুধু শিল্পীদেরই শিল্প। স্টুডিওতে, স্টেজে, হয়তো টেলিভিশনের পর্দাতেই তাকে 'ধরে রাখতে হবে'। মজা এই যে ফ্ল্যামেংকো সম্পর্কে এ খবরটিও আমি পেয়েছি টেলিভিশনের মাধ্যমেই: বি-বি-সি-র একটি ফ্ল্যামেংকো-সমীক্ষায়।

সন্দেহ নেই যে, প্রতিকূল জলবায়ুর সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত টেলিভিশনসেবনের কিছু যোগাযোগ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবন যেমন ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে রাস্তায় উপচে পড়ে, বিকেল-সন্ধ্যায় রোয়াকে এবং দাওয়ায় আড্ডা জমে উঠে, শীতপ্রধান দেশের মানুষ তেমনি ভালোবাসে দিনের কাজ শেষ করে খাওয়াদাওয়া সেরে জানলার পর্দা টেনে আগুন পোহাতে, আর সেই অলস মুহূর্তে টেলিভিশন যে সাধারণ মানুষের সন্ধ্যাসঙ্গী হয়ে উঠবে তা প্রত্যাশিতই বটে। যারা রান্নাবান্নার ঝামেলার মধ্যে যেতে নারাজ তারা রেডি-মেড খানা চটপট গরম করে নিয়ে কোলের উপর ট্রে-তে সাজিয়ে বসে পড়ে; খাওয়া আর টেলিভিশন দেখা একসঙ্গেই চলতে থাকে। বাইরে যখন বরফ ঝরছে বা উত্তুরে হাওয়া বইছে তখন গৃহাভ্যন্তরের নিশ্চিন্ত উষ্ণতায় সুইচ টিপে প্রাপ্তব্য প্রমোদই যে মানুষের প্রিয়তর হবে এ তো স্বাভাবিকই। এও নিজের পর্যবেক্ষণ থেকেই জানি যে, এ দেশের মানুষ গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালেই বেশি ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে। টেলিভিশনে পরম আসক্ত বালকেরাও জুন-জুলাইয়ের রোদে ভরা লম্বা দিনগুলি এলে ফুটপাথে সাইকেল চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে রোদের দেশের মানুষ

শীতের দেশের মানুষের চাইতে দৈনিক কত ঘণ্টা কম টেলিভিশন দেখে, জলবায়ু অনুসারে এই নেশাটা ঠিক কী হারে বাড়ে বা কমে সে-জাতীয় কোনো পরিসংখ্যান আমার জানা নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাজিলের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও টেলিভিশন প্রতাপশালী। ব্রাজিলের টেলিভিশনে সরকারী প্রচার প্রচুর পরিমাণে হয়ে তো থাকেই, উপরন্তু একটি চ্যানেল শ্রমিকশ্রেণীর ছেদহীন চিত্তবিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট। সে চ্যানেলটিতে ভোর থেকে গভীর রাত অবধি নাচগান, ভাবাবেগে আপ্লুত নাটক, বীররসে ভরপুর আখ্যান ইত্যাদি পরিবেশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ চ্যানেলটির ভূমিকা বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়। অপর পক্ষে কিউবাও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং তার টেলিভিশনও সরকারী প্রচারে নিযুক্ত, তবে দুই দেশের প্রচারে বিস্তর প্রভেদ। কিউবার টেলিভিশন কঠোর আদর্শবাদী, বিপ্লবকে সার্থক করার কাজে উৎসর্গীকৃত, এবং শুধু প্রমোদবিতরণ তার উদ্দেশ্য নয়।

৩

এবারে আসা যাক পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে টেলিভিশনের কী প্রভাব তার পর্যালোচনায়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এই পরিবেশে মা ও শিশুর নিঃসঙ্গতার কথা। তৃতীয় দুনিয়ার বস্তিবাসিনী মায়ের শিশু হয়তো অপুষ্টিতে ভুগছে, তার নেই দুধ বা রোগের পথ্য, কিন্তু তাদের চারদিকে আছে মানুষের উত্তাপ ও কলরোল। অপর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারের মা ও শিশু ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবৃত হয়েও মানবিক সঙ্গ থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন, যেন দ্বীপবর্তী। এই নিভৃত পরিবেশে শিশুদের মুখে কথা সাধারণত একটু দেরিতেই ফোটে। একাধিক লোক শিশুদের সঙ্গে অনর্গল কথা বললে শিশুরা তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে। পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারের প্রাগ্‌-বিদ্যালয় শিশু সারাটা দিন কাটায় শুধু মায়ের সান্নিধ্যেই। তার অন্য কোনো পরিচারিকা তো নেইই, রোজগারী বাবার সঙ্গেও তার আদানপ্রদানের প্রধান সময় হপ্তাশেষটুকু। বিশেষত স্মরণীয় যে, শীতপ্রধান দেশের শিশুরা সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায়; ফলে তাদের বাবারা যখন কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরে তখন তারা হয় শুয়ে পড়েছে নয় শুতে যাবে।

শিশুর জন্মের পর বর্ধিত গৃহকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের দেহমনের সবকিছু

থোরাক জোগানোর ভার এসে পড়ে একা যুবতী মায়ের ঘাড়ে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়, পরিচারক-পরিচারিকার সহায়তা ছাড়া, গৃহকর্ম এবং শিশুদের তত্ত্বাবধান যে কতখানি শ্রমসাধ্য এবং কী পরিমাণ মানসিক উত্তেজনা ও ক্লেশ সৃষ্টি করতে পারে তা যিনি এ কাজ করেন নি তাঁর ধারণার বাইরে। উপরন্তু মনে রাখতে হবে যে, জীবনযাত্রার উন্নত মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘরকন্না এবং সন্তানপালনের মানও পশ্চিমে রীতিমত উঁচু। নারীর কর্মকুশলতা এবং গুণবৈচিত্র্যের ব্যাপারে এ সমাজের প্রত্যাশা প্রায় অসীম, এবং এখানে সুগৃহিণী আখ্যা পাওয়া কোনো মুখের কথা নয়। 'ভালো বৌ', 'চমৎকার মেয়ে', 'দারুণ গিন্নী', এবংবিধ নাম কিনতে হলে প্রায় চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হওয়া দরকার। শুধু বসবার ঘরটিকেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে চলবে না, রান্নাঘরটিকেও ফিটফাট ধোপদুরস্ত পরিচ্ছন্নতায়, এমন কি বসবার ঘরের মতই শৌখিন শোভন শ্রীতে মণ্ডিত অবস্থায় রাখতে হবে। বাড়ির সামনে বা পিছনে ফাঁকা জায়গা থাকলে তাকে মালীর সাহায্য ছাড়াই ফুল আর সব্জিতে ভরিয়ে তুলতে না পারলে প্রশংসা পাওয়া যাবে না। তা ছাড়াও বাড়ির ভিতরে জানালার তাকে যেখানেই রোদ পড়ে সেখানেই সারি সারি টবে ফুল বা পাতাবাহারের কেয়ারি করতে পারা চাই। পশম বোনা, শৌখিন সেলাই ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিলাম, সে সব ছেলেখেলা মাত্র: গাড়ি চালানো, দরজা-জানালা-দেয়াল রঙ করা, ওয়ালপেপার লাগানো, এসব কাজে অভিজ্ঞতাও নিতান্তই প্রত্যাশিত। কাঠের কাজ এবং ইলেকট্রিক মেরামতের কাজ জানা থাকলে আরোই ভালো। রোজকার আহার জোগানো ছাড়াও হরেক রকমের মিষ্টি রান্না, কেক-পেস্ট্রি-বিস্কুটের বেকিং, পার্টির উপযুক্ত রন্ধনপ্রণালী ও পরিবেশনের কায়দাকানুন রপ্ত থাকা চাই; এবং বাজার করা থেকে শুরু করে পরিবেশন করা পর্যন্ত প্রতিটি অনুপুঙ্খই নিজের হাতে করতে হবে, বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহিণীর মত পরিচারক-পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে নয়। এ সমাজের পুরুষেরা যদিও বাধ্য হয়েই গৃহকর্মে হাত লাগায়, তবুও মোটের উপর তারা যেহেতু দিনের অধিকাংশ সময় রোজগারে ব্যস্ত এবং ঘরের বাইরে, তাই সংসারের হাজার কাজের প্রধান দায়িত্ব অনিবার্যত স্ত্রীদের ঘাড়েই এসে পড়ে।

ফলে এ সমাজে কচি শিশুদের মায়েরা যে প্রায়ই ক্লান্তি, নৈরাশ্য, বিষাদ বা স্নায়বিক বৈকল্যের শিকার হয়ে পড়েন তা আর আশ্চর্যের কী। প্রায় নিরুপায় হয়েই মায়েরা তাঁদের শিশুদের বসিয়ে দেন টেলিভিশনের সামনে। শিশুদের

কান্নাও থামে; মায়েরা ও হাতের কাজ এগিয়ে নেন। যে পরিবেশে শিশুরা দীপবর্তী, মানবিক ভাববিনিময় থেকে বঞ্চিত, সেখানে টেলিভিশন হয়ে ওঠে তাদের সঙ্গী, একাধারে ধাই-মা; বেবী-সিটার; খেলা-দেনেওয়ালী দিদি; গল্প-বলিয়ে ঠাকুমা। যারা মানুষের মুখ থেকে মাতৃভাষা শোনার সুযোগ কম পায় তারা টেলিভিশন থেকেই অনেক নতুন শব্দ শিখে নেয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ব্রিটেনের শিশুরা মুখ্যত বি-বি-সি-র 'Playschool', 'Jackanory' ইত্যাদি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান থেকেই শেখে তাদের ঐতিহ্যের ছেলে-ভুলানো ছড়া, গান এবং রূপকথাগুলি। শিশুদের বড় হয়ে ওঠার জীবননাট্যে ঠাকুমা-দিদিমা-মাসী-পিসী-মামা-কাকাদের কথকতার যে-ভূমিকাটি প্রাচ্য যৌথ পরিবারে ধরেই নেওয়া হয় তার অভাবে পাশ্চাত্ত্য কোষ-পরিবারে টেলিভিশনই হয়ে ওঠে আত্মীয়তুল্য। বাক্সের পর্দাতেই চেনা হয়ে যায় অনুষ্ঠান-পরিবেশকদের মুখ; এই 'টেলি-তুতো' মামা-কাকা ও মাসী-পিসীরাই আপন আত্মীয়স্বজনের চাইতে বেশি পরিচিত হয়ে যায়।

শিশুরা যত বড় হয়, টেলিভিশন তাদের জীবনে তত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকে। আগেকার দিনের চারণদের মত আজকের টেলিভিশন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, শিক্ষক তথা প্রমোদ-পরিবেশক। স্কুলের ভূমিকা থেকে তার ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢের বেশী। বি-বি-সি-র ছোটদের জন্য অনুষ্ঠানগুলি যে সত্যিই মনোজ্ঞ তা স্বীকার করার জন্য 'সাহেবদের বুটজুতো-চাটা' হবার কোনো দরকার নেই। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার বিপুল আয়োজনে বি-বি-সি অপরাজেয়। স্কুল-কলেজের ক্লাসঘরে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী তো আছেই, তা ছাড়াও দেশবিদেশের মানুষ, জীবনধারা, ঘটনাবলী, পশুপক্ষী, গাছপালা ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর দিতে, দেশবিদেশের নানান সমস্যা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করতে, বিজ্ঞানকে ঘরোয়া ব্যাপার করে তুলতে কিশোরদের বিশ্ব-সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে বি-বি-সি-র আত্মনিবেদন সত্যিই প্রশংসনীয়। সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতি বিকালে 'John Craven's Newsround'-এ ছোটদের জন্য খবর পড়া হয়, এবং খবর শোনার পর আমার ছেলেরা প্রায়ই গম্ভীর মুখে রান্নাঘরে এসে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে যায়, 'তিমিমাছদের অবস্থা খুবই খারাপ, শিকার করে করে তাদের ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে', কিংবা 'ইথিওপিতে আরেক দফা সাইক্লোনের উৎপাত হয়ে গেলো'।

এ ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ে এমন কতগুলি অনুষ্ঠান আছে যা ছোটরা

বড়দের সঙ্গে একসঙ্গে বসে দেখতে পারে। আমি ভাবছি 'Tomorrow's World', 'The World About us', 'Horizon' ইত্যাদি সিরিজের কথা। আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করবো যে এ জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে আমি নিজে বিপুলা এ পৃথিবী ও বিপুলতর সৌরজগৎ সম্বন্ধে অমূল্য শিক্ষা আহরণ করেছি। নানান অরণ্যের আদিবাসীদের জীবন, নানান সমুদ্রের তিমি-হাঙর, বরফের দেশের বল্‌গা হরিণ বা পেংগুইন পাখি, ব্রাজিলের কার্নিভ্যাল, কিউবার আখের ক্ষেত, চীনের 'কমিউন', পিকিং-এর চিড়িয়াখানা, মঙ্গোলিয়ার প্রান্তর, তিব্বতের অভ্যন্তর, মস্কোর বলশয় থিয়েটার থেকে রিলে-করা ব্যালে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাবলী, বালির সুকুমার সৌন্দর্য, শ্যামদেশের বৌদ্ধ মঠ, মালয়ের হিন্দুদের চড়কতুল্য শৈব উৎসব, মার্কিন সৈন্যদের সাইগন-ত্যাগ, উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যদের সাইগনে জয়প্রবেশ, মায় হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সত্য দৃশ্য, চাঁদে মানুষের পদক্ষেপ, বা মঙ্গলগ্রহের লাল-পাথর-ছড়ানো শরীর—এত রকমের, এত বিচিত্র দৃশ্য কি টেলিভিশন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বাড়িতে বসে দেখতে পারা যেতো? এ যেন ঘরের ভিতরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বক্তৃতামালার চাইতেই অনুষ্ঠানগুলি সার্থকতর, সুন্দরতর, শব্দ ও দৃশ্যের সমন্বয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্যভেদী। সাম্রাজ্যের অনিবার্য অবক্ষয়ের পর ব্রিটিশ সভ্যতার প্রকৃত মূলধন তার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ, তার চিন্তাজীবনের বৈদগ্ধ্য। সেই মূলধন খাটিয়েই বি-বি-সি টেলিভিশনের রাজা হতে পেরেছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনের 'Open University' বা 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' বি-বি-সি-র মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বক্তৃতামালা পেশ করে।

৪

বস্তুত, ছোটদের এবং বড়দের এই দুই দলেরই মানসিক দিগন্তের সম্প্রসারণে বি-বি-সি-র কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সংগীত, নাটক, অপেরা ইত্যাদির পরিবেশন তো আছেই, তা ছাড়াও সাহিত্য, চিত্রকলা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, চিকিৎসাবিদ্যা, নগর-পরিকল্পনা, স্বদেশের ও বিদেশের সামাজিক সমস্যাবলী ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদি, অপরাধ ও দণ্ডনীতি, শিক্ষা, সন্তানপালন, নারী-আন্দোলন, ···এমন বিষয় নেই যার উপরে মননশীল আলোচনাচক্র বা অন্য কোন সুচারু অনুষ্ঠান বি-বি-সি প্রচার করেনি। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উপর একটি সিরিজ হয়ে গেল যার তুলনীয়

কোনো আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে পারলে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দর্শন-বিভাগের প্রধানেরা গর্বিত বোধ করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একটি গোপন চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার কিভাবে স্তালিনের হাতে হাজার হাজার রুশ বন্দীদের সমর্পণ করে—তাদের মৃত্যু অবধারিত তা জেনেও—সে-সম্পর্কে একটি বিস্তারিত তথ্যচিত্র পরিবেশন করে বি-বি-সি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক ব্রিটেনে বর্ণসমস্যা বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ আলোচনাচক্র থেকে এ প্রসঙ্গে এ দেশে যত রকমের মতামত আছে সবই জানতে পারা গেলো। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ ধরনের চিন্তাশীল কার্যক্রম দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, দর্শকদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'a spectrum of opinion' সেই মতামতের বর্ণালীর প্রদর্শনে দর্শকদের স্বাধীন বিচারশক্তিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস যে, একতরফা যুক্তির, সাফাই গাওয়ার, একপেশে মত প্রচারের সংকীর্ণতার চেয়ে এই তথ্যের সমারোহ ও মতামতের ইন্দ্রধনুই নাগরিকদের বিশ্লেষক বুদ্ধিকে তথা সমালোচনাশক্তিকে বেশী পুষ্ট করতে পারে। এবং এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকদের একটি কথা না বলে পারি না। ইংরেজদের আর যত দোষ থাক, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, তারা অপরকে যতটা সমালোচনা করে তার চাইতে নিজেদের স্খলন-পতন-ত্রুটির সমালোচনা করে ঢের বেশি, এবং অপরকে উপহাস না করে বরং নিজেদের সমাজের হাস্যকর ব্যাপারগুলি নিয়েই হাসাহাসি করে। বি-বি-সি সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাত্রাতিরিক্ত কাতরতা দেখিয়েছিলেন। ভারত বা শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে কোনো অন্যায় মন্তব্য বা অশালীনতা বি-বি-সি-তে কখনো লক্ষ্য করি নি। অথচ রক্ষণশীল দলের নেত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচারকে প্রায়ই সূক্ষ্মভাবে ঠেস দেওয়া হয়ে থাকে, এবং তার আগে টেড্ হাথ্‌কে দেওয়া হোতো। জনপ্রিয় কমিক সিরিজ 'The Goodies'-এর অভিনেতাদের নীতিবাক্য হোলো: 'আমরা যেথানে যা খুশি তাই করি', এবং এদের ভাঁড়ামির পিছনে প্রায়ই থাকে যথার্থ স্যাটায়ার, শ্লেষাত্মক সামাজিক-রাজনৈতিক সমালোচনা। এই সিরিজটিতে রানী এলিজাবেথ বা হ্যারল্ড্ উইলসনকে নিয়ে যে মস্করা দেখেছি তার তুলনীয় ঠাট্টাতামাশা অন্য অনেক দেশেই অভিনেতা-প্রযোজক-পরিচালক সবাইকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়তো। স্মরণীয় যে, রঙ্গতামাশার মাধ্যমে বা তার ফাঁকে ফাঁকে সীরিয়াস কিছু বলার এই চেষ্টা শেক্সপীয়র থেকে বার্নার্ড শ পর্যন্ত কমিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার।

আগেই বলেছি যে, প্রাচীনকালের চারণদের মত আধুনিক টেলিভিশন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, শিক্ষক তথা প্রমোদ-পরিবেশক। তবে ঐতিহ্যের সম্প্রসারণে, তাতে নতুন উপাদান বা মাত্রা যোজনার চেষ্টায় টেলিভিশন রেনেসাঁস-উত্তর যুগেরই প্রতিষ্ঠান। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আরও অনেকে ক্রিয়াকলাপের মত টেলিভিশন বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ দ্বারা আক্রান্ত—আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা, বিষয়াশ্রয়িতা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষানিরীক্ষা প্রভৃতিতে তার উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশনের ক্রমোন্নতি অবধারিত। সে প্রসঙ্গে পরে আবার আসছি। আপাতত উল্লেখ করতে চাই যে, নিছক মনোরঞ্জনে টেলিভিশনের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর চলচ্চিত্রশিল্প যেমন হটে যাচ্ছে—আমাদের পাড়ার হলটিও সম্প্রতি উঠে গেল—তেমনি, আমার বিশ্বাস, তার দৌলতে পাশ্চাত্ত্য পুরুষের সন্ধ্যে হলে পাবে দৌড়নোও খানিকটা কমেছে। পাবের বিকল্প টেলিভিশন। সাধারণ নাগরিক কর্মস্থল থেকে ফিরে দু চার ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে। হপ্তাশেষে টেলিভিশন দর্শন অনেকখানি বেড়ে যায়। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই ছুটি মার্কা বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। শনিবারে আসর জমজমাট। ঐ দিন বি-বি সি র যুগল চ্যানেলের প্রসাদে বাড়িতে বসে চার-চারটি পূর্ণাংগ ফিল্ম দেখা সম্ভব। রবিবারের সকালে এ দেশে অনেকেই যেহেতু বেলায় শয্যাত্যাগ করেন, সেহেতু ঐ সকালটি এশীয় আগন্তুকদের জন্য অনুষ্ঠান, ফরাসী বা জার্মান ভাষা শিক্ষার আসর, এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য চিহ্নিত। খ্রীষ্টান দেশের মানুষের অবশ্য রবিবারে ধর্মচিন্তা করার কথা। ধর্মবিশ্বাসের স্রোত মন্দগতি হয়ে এসেছে, গির্জাগুলিতে ভিড় হতে চায়না। যারা বাড়িতে বসেই উপাসনার পরিবেশটুকু পেতে চান তাঁদের জন্য কিছু রবিবাসরীয় পূজা-আর্চা, ভজন গান ইত্যাদি কোনো গির্জা বা ক্যাথিড্রাল থেকে রিলে করার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য প্রসঙ্গত এ-ও উল্লেখযোগ্য যে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে প্রশ্ন করে আলোচনার সূত্রপাত করতেও বি-বি-সি পশ্চাৎপদ নয়, এবং সম্প্রতি বি-বি-সি-র "Who was Jesus?' অনুষ্ঠানটি থেকেই প্রথম খবর পেলাম যে খ্রীষ্টধর্মের কোনো কোনো মুখপাত্রই বলতে শুরু করেছেন যে, যীশু একজন ইহুদী ধর্মগুরু ছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের অবতার ছিলেন না।* রোববারের দুপুর থেকে বি-বি-সি-র কার্যক্রম হালকা এবং গুরুগম্ভীর কর্মসূচীর ঠাসবুনটের একটি পরাকাষ্ঠা। তিনটি

* সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি। "যীশু কে ছিলেন?" এই নামে দীর্ঘ প্রবন্ধটি কিছুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

গোটা ফিল্মের ব্যবস্থা। ফলে সপ্তাহান্তে বাড়িতে বসে দুদিনে সাতটি ছবি দেখা সম্ভব, যে-কারণে সিনেমাহলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হুল্লোড়ের ফাঁকে ফাঁকে তুষার যুগ কাকে বলে, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ কেন হয়, হাইডেগারের অস্তিত্ববাদের স্বরূপ কী, এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানও ঢোকানো থাকবে।

কোষ-পরিবারপ্রথার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিণাম প্রৌঢ় বয়স থেকেই নরনারীদের জীবনে নতুন করে নিঃসঙ্গতার উদয়। প্রাক্-বিদ্যালয় পর্যায়ের শিশুকে মানুষ করার সময় যুবতী মা যে ক্লেশ ও নিঃসঙ্গতা সহ্য করেন তার খানিকটা লাঘব হয় ছেলেমেয়েদের স্কুলজীবনের সময়ে। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গীর কোঠায় চলে আসে, বন্ধুবান্ধব ঘরে আনে, হয়তো তাদের মায়েদের সঙ্গেও আলাপ জমে যায়। জন্মদিনের পার্টি এবং ক্রিসমাস উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়িতে আনন্দের সাড়া জাগে। কিন্তু দুটি দশক যেতে না যেতেই থেমে যায় এ কোলাহল। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে চলে যায় যে যার কর্মস্থলে, বা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটেনে ছেলেমেয়েদের ষোল বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ; তারপর তাদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সত্তা স্বীকৃতি পায়, এবং বেকার থাকলে তারা বেকারভাতার দাবিদার হতে পারে। ফলে এই বয়স থেকে তারা বাপ-মায়েদের থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ দেশের ছেলেমেয়েরা এমনই স্বাধীনতার ভক্ত যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে এক শহরে থাকলেও প্রায়ই চাকরি পেলেই—বিয়ের আগেই—তারা আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে যেতে চায়। তারপর তাদের নিজস্ব সংসার পাতবার, নতুন পারিবারিক ইউনিট স্থাপন করবার সময় তো এসেই পড়ে। প্রৌঢ় বয়স থেকে আবার একলা হয়ে যান অধিকাংশ বাপ-মায়েরা। এবং স্বামী-স্ত্রীর এক মুহূর্তে মৃত্যু যেহেতু দুর্লভ, সেহেতু কোষ-পরিবারের সভ্যসংখ্যা বিলুপ্তির আগে দুই থেকে একে ঠেকে। বিধবা, বিপত্নীক, বা অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা টেলিভিশনের বড় রকমের গ্রাহক। দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যাগুলিতে টেলিভিশন তাঁদের সময় কাটাতে অমূল্য সাহায্য করে, নির্জন ঘরে এনে দেয় মানুষের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর, হাস্যরোল, সান্নিধ্য। যাঁরা বিশেষভাবে জরাগ্রস্ত, বা বাতের রোগী, বা পক্ষাহত, তাঁদের পক্ষে টেলিভিশন দেবতার বরের সমান। কেউ কেউ বসবার ঘরে একটি, শোবার ঘরে একটি, দুটি সেটের ব্যবস্থা করেন। কোনো নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়াকে আমি বলতে শুনেছি : 'টেলিভিশনে কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। যখন একলা লাগে, তখন নিজেকে বোঝাই, ঐ তো ওরা হাসছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে, রসিকতা করছে।

রিচার্ড বেকার, অ্যাঞ্জেলা রিপন ** এঁরা আমার দিকে, আমার মত কত একলা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে খবর পড়ছেন।' এইভাবে টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানপরিবেশকেরা বা অভিনেতারা টেলি-তারকায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। বি-বি-সি-র পুলিশ-সংক্রান্ত সিরিজ 'Dixon of Dock Green' বা আই-টি-ভি-র শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সিরিজ 'Coronation Street' জনমানসে প্রায় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। শুনেছি যে, দর্শকদের অনেকের নাকি খেয়াল থাকে না যে, চরিত্রগুলি ও ঘটনাগুলি কল্পিত, এবং গল্পের মধ্যে একজন মারা যাওয়ার পর যিনি অভিনয় করছিলেন তিনিই মারা গেছেন এই ভেবে কোনো দর্শক নাকি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সমবেদনা জানিয়ে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন, যেমন পশ্চিমে রীতি। এই ধরনের অনুষ্ঠানে পাই টেলিভিশনের একটি ঘরোয়া ঘরানা, যার ভূমিকা পারিবারিক প্রমোদবিতরণ ও সমাজের সাধারণস্বীকৃত মূল্যবোধগুলির সংরক্ষণ। আবার অন্য আরেক ধরনের অনুষ্ঠানে প্রচলিত ভাবনা বা মূল্যবোধকে প্রশ্ন বা সমালোচনা করা হয়। ফলে স্থিতি ও পরিবর্তন, সমাজ-ব্যবস্থার এই দুই প্রবণতাই টেলিভিশনে প্রতিফলিত হয়, যেমন হয় সাহিত্যে।

৫

এবারে আসতে হয় টেলিভিশনের কতগুলি নঙর্থক দিকের আলোচনায়। প্রথমত, টেলিভিশনের উপস্থিতি দৈনন্দিন জীবনে কতগুলি অপ্রিয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। টেলিভিশনের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ছেলেবুড়ো সবাইকারই সামাজিকতায় ভাঁটা পড়ে। শুধু যে আহারনিদ্রা শিকেয় ওঠে তাই নয়, গৃহে অতিথি এলে অতিথি সৎকারে ত্রুটি হয়, অতিথির সঙ্গে কথা না বলে গৃহস্বামী ও গৃহিণী সম্মোহক টেলিভিশনের দিকেই তাকিয়ে থাকেন; ছোটরাও উঠে দাঁড়াতে, স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে ভুলে যায়। পাছে তাদের কোনো প্রিয় অনুষ্ঠান দেখা বাদ পড়ে যায় সেই ভয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াতে যেতে পর্যন্ত চায় না, কিংবা কোথাও গেলে ফিরে আসার জন্য ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকে এবং ভবিষ্যতের আনন্দকে হারানোর আশঙ্কায় বর্তমানের আনন্দটুকুকে পুরোপুরি উপভোগও করতে পারে না। টেলিভিশনের সম্মোহনশক্তিকে বোধহয় খানিকটা এড়াতে পারে প্রথম যৌবন, হয়তো নিছক জৈব তাগিদেই। কিন্তু প্রেমে পড়ার বা সাথী খোঁজার পর্যায়টা

** এঁরা বি-বি-সি টেলিভিশনে খবর পড়েন।

পেরিয়ে গেলে আবার যে-কে-সেই। তখন বিবাহিত দম্পতিরা বিশ্রম্ভালাপের বদলে টেলিভিশনদর্শনে ব্যস্ত থাকেন। ফলে এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, টেলিভিশনের শারীরিক উপস্থিতি এমন একটা প্রলোভন, যাকে এড়ানো কঠিন। এই গৃহস্থিত চলচ্চিত্রের উৎসটিকে সর্বদা খুলে রাখার লোভ অনেকেই সংবরণ করতে পারেন না। ঠিক যেমন গরমের দিনে বিজলী পাখাকে কেউ বন্ধ করতে চান না, ঠিক তেমনই অনর্গল বক্‌বক্‌ করতে থাকা টেলিভিশনকে বোতাম টিপে বন্ধ করে দেবার জন্য কেউ উঠতে চান না, তার জন্য যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। এই যন্ত্রটির বিরামহীন বাচালতা ও পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী মানবিক ভাববিনিময়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

সব থেকে বেশি বিপদ ছোটদের। একেবারে ছেড়ে দিলে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন দেখেই কাটিয়ে দিতে পারে। আগেকার দিনে আমরা জানতাম যে মেধাবী ছেলেমেয়েরা 'বইয়ের পোকা' হয়। বইয়ের পোকা হতে হলে খানিকটা মাথা খাটাতে হয়। টেলিভিশনের পোকা হওয়া তার চাইতে অনেক সহজ; মাথা ঘামানোর কোনো দরকারই নেই, সোফায় গা এলিয়ে চোখ খুলে বসে থাকলেই হোলো। কাজেই পাশ্চাত্ত্য সমাজের ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে টেলিভিশনের পোকা বিস্তর। বাধা দিতে গেলে সরব প্রতিবাদ অবধার্য। কোনো এক শনিবার আমার ছেলেদের আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম, বাধা না দিলে তারা কত ঘণ্টা টেলিভিশন দেখতে পারে তা দেখার উদ্দেশ্যে। সেদিন আমার বড় ছেলে সাড়ে ন' ঘণ্টা টেলিভিশন দেখেছিলো, ছোটজন তার চাইতে খানিকটা কম।

মুশকিল এই যে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে টেলিভিশন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং হাজার হাজার লোকের জীবিকা তার সঙ্গে বাঁধা। এতজন কর্মীকে কাজ জোটাতে গিয়ে তার অনুষ্ঠানসূচীও হয়ে পড়েছে বড্ড বেশি দীর্ঘকালস্থায়ী, ফলে ভালো-মন্দ-মাঝারিতে মেশানো। কোষ-পরিবারের নিঃসঙ্গতাকে সে যেমন দূর করে, আবার তেমনই ঘরের মধ্যে একবার খুঁটি গেড়ে বসলে অনাহূত আগন্তুকের মত বসেই থাকে, উঠতে চায় না। হয়তো দুটি ভালো অনুষ্ঠানের মাঝখানে আধঘণ্টাখানেক এমন একটি অনুষ্ঠান যা দেখা সময়ের অপচয়মাত্র। ছোটরা সাধারণত ঐ আধ ঘণ্টা উঠে অন্য কিছু করতে চাইবে না, ঠায় বসে থাকবে। তা ছাড়া কোনো 'সীরিয়াস হবি'-র পক্ষে টেলি-রুটিন থেকে মেরে-কেটে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় করে

নেওয়া পর্যাপ্তও নয়। আবার হয়তো যেসব অনুষ্ঠান দেখলে তারা সত্যিই লাভবান হতে পারতো সেগুলিকে দেখানো হচ্ছে অনেক রাতে, যখন তাদের ঘুমোতে যাবার সময়। এটা তো প্রায়ই হয়। শনিবারের সকাল ধরে বা সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে সন্ধ্যা ছটা-সাতটার 'peak viewing time'-এ হয়তো চললো নিছক ভাঁড়ামি বা কোনো আদ্যিকালের 'Cowboys and Indians' ফিল্ম, অথচ কোনো ভালো অপেরা, ব্যালে, নাটক, ফিল্ম বা আলোচনাচক্রের সময় নির্দিষ্ট হোলো রাত সাড়ে নটায় বা সাড়ে দশটায়। তাদের সুরুচির পরিশীলনের পক্ষে এমন ঘটনা সুযোগের শোচনীয় অপচয়।

টেলিভিশন দেখাটা এক রকমের 'passive entertainment' যা দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে না। ফুটবল না খেলে, বাজনা না বাজিয়ে অভিনয়ে না নেমে হাত-পা গুটিয়ে বসে খেলাধূলা, বাজনা বা অভিনয় টেলিভিশনের পর্দাতেই দেখা যায়) এই নিষ্ক্রিয়তা দু-ভাবে ক্ষতিকর। প্রথমত, এর ফলে ছোটরা অলস হয়ে পড়ে। তাদের মূল্যবান অবসরসময়ে, যখন তারা অন্য কোনো নেশা নিয়ে মাততে পারতো, তখন তারা আজে-বাজে অনুষ্ঠান দেখে সময় নষ্ট করে। খেলাধূলা, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, বই-পড়া, হোম-ওয়ার্ক ইত্যাদি রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, বিশেষত সেই ক্রিয়াকলাপই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেগুলি সময়-সাপেক্ষ ও অনুশীলনসাপেক্ষ, যেগুলির জন্য চাই উদ্যম ও নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ। নিছক সময়ের অপচয়ের ফলে তো বটেই, তা ছাড়াও সৃষ্টিশীল বৃত্তিগুলিতে জড়তা আসার ফলে টেলি-লালিত শিশুদের পক্ষে শিল্পী, কবি, সংগীতজ্ঞ বা গণিতজ্ঞ হয়ে ওঠা কঠিন হতে পারে—অন্তত আমার সেই ভয় হয়। যেসব মায়েরা চান যে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের কিছু 'সীরিয়াস হবি' থাকুক তাঁদের রীতিমত সংগ্রাম করতে হয় সন্তানদের সঙ্গে। এদিকে কোষ-পরিবারে বাপ-মায়ের কর্তৃত্ব প্রাচীনপন্থী নয় বলে এই সংগ্রামের টেনশনও তীব্র এবং মায়েদের পক্ষে বিশেষ ক্লান্তিকর। যেখানে ঠাকুর্দা-জ্যাঠাদের শাসন নেই, মাসী-পিসীদের সর্দারি নেই, বড়দের চোখ-রাঙানি অনেক কম, সেখানে ছোটদের স্বাতন্ত্র্য অনেক বেশি। অন্যান্য মাতব্বরদের অনুপস্থিতিতে শিশুরা তাদের বাপ-মায়ের বেশি কাছাকাছি, সমান-সমান, বন্ধুতুল্য। এই সাম্য নানা দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় হলেও কতগুলি ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এবং আলোচ্য প্রসঙ্গ সেগুলির অন্যতম। 'এখন টেলিভিশন দেখা চলবে না' বললেই কোষ-পরিবারের ছেলেরা তা মেনে নেবে না, তাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ বিতর্কে নামতে হবে, এবং তার জন্য যে সময় ও ধৈর্যের দরকার তা কতজন

মায়ের থাকতে পারে? আর বাপেরা তো হামেশাই দৃশ্যে অনুপস্থিত, স্রেফ নেপথ্যচারী। ফলে টেলিভিশন দেখা উপলক্ষ্য করে মা ও ছেলেদের মধ্যে নিত্য-নৈমিত্তিক দ্বন্দ্বও পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

নিষ্ক্রিয় গ্রহণশীলতার মেজাজে শিশুরা যখন টেলিভিশনের সামনে গা এলিয়ে বসে থাকে তখন পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন তাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বি-বি-সি অবশ্য বিজ্ঞাপন বহন করে না, কিন্তু আই-টি-ভি-র অনুষ্ঠানগুলি সেই 'রেডিও সিলোন কি ব্যাপারী ভাগ', যা এখনও চালু আছে কি না আমার জানা নেই, তারই মত ব্যাপার—কর্মসূচীর ফাঁকে ফাঁকেই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। এই মানসিক ভেষজ নিয়মিত সেবন করার পর ছোটরা খবরের কাগজ পড়তে শেখার ঢের আগেই চকোলেট-লজেন্স-আইসক্রীম-সাবান ইত্যাদি ব্যাপারে এমন বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়ে যে, হাতব্যাগে-সীমিত-টাকাকড়ি-ধারিণী বেচারী মায়ের পক্ষে তাদের নিয়ে হাটবাজার করাই দায় হয়, অথচ বাচ্চাদের আয়ার জিম্মায় রেখে বাজারে বেরোনোও পশ্চিমে সম্ভব নয়!

ভোগসামগ্রীর ব্র্যাণ্ড-নাম সম্পর্কে শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা অপ্রীতিকর, অসুবিধাজনক, হয়তো অবাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু তাদের কচি মনে ফিল্মী যৌনতা ও হিংসাদৃশ্যের প্রভাব নিশ্চয় আরও অনেক গুরুতর বিষয়। এ ব্যাপারে প্রধান অপরাধী বৃহত্তর চলচ্চিত্রজগৎ থেকে প্রদর্শিত ছবিগুলি,—সংক্ষেপে বলা যায় যে, যে-জগৎটা আগে সিনেমাহলে আবদ্ধ ছিলো তা এখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে—কিন্তু টেলিভিশনের স্বনির্মিত নিজস্ব কর্মসূচীও এ গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। এবং যতদূর শুনেছি, ব্রিটিশ টেলিভিশনে যতটা যৌনতা, মারামারি, বা খুনোখুনি দেখা যায় মার্কিন টেলিভিশনে দেখা যায় তার চাইতে ঢের বেশি। ছোটদের মনে 'টি-ভি সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স'-এর প্রভাব ক্ষতিকর কিনা সে-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে তর্ক আছে, কিন্তু তর্কের মীমাংসা নেই, এবং তর্ক চলাকালীন ছোটরা সমানে টেলিভিশন দেখে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সাধারণভাবে অভিভাবকদের উদ্বেগ অবশ্যই আছে, এবং নাগরিকদের মধ্যে টি-ভি যৌনতা ও হিংসাদৃশ্যের বিরোধী 'লবি'-ও আছে। লক্ষণীয় যে, যাঁরা মনে করেন যে, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই তাঁরা অল্পশিক্ষিত নন, উচ্চশিক্ষিতই বটে। মনোবিজ্ঞানীরা এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বিরোধী রায় না দেওয়া পর্যন্ত এঁরা মত বদলাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এঁরা প্রতিভাত হন পশ্চিমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্যের দাসরূপে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর এঁরা এতখানি

নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যে, সামাজিক মানুষকে কিভাবে সাধারণ জ্ঞান খাটাতে হয় তা ভুলে মেয়ে দিয়েছেন। আমি স্কুলের শিক্ষিকা, ধর্মযাজকের স্ত্রী, এ হেন শিক্ষিতা মায়েদের বলতে শুনেছি যে, টি-ভি-তে প্রদর্শিত খুনখারাপি বা অশ্লীলতার কোনো কুপ্রভাব নেই। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, পৃথিবীতে 'সুপ্রভাব' বলে যদি কিছু থাকে, তবে 'কুপ্রভাব'-ই বা থাকবে না কেন? আমরা কি তেমন কোনো পীর-পয়গম্বর-অধ্যুষিত পুণ্যলোকে বাস করি যেখান থেকে 'সু' ও 'কু'-র দ্বন্দ্ব নির্বাসিত হয়েছে? হয়তো যাদের পাথরের মত নিরেট, কঠিন মন তাদের মনে সুপ্রভাব-কুপ্রভাব কিছুই পড়ে না, কিন্তু সুকুমার, স্পর্শকাতর, কল্পনাপ্রবণ মনে শুভ-অশুভের কোনো প্রভাব পড়ে না এমন কথা—বিশেষত আদম-ঈভের আপেল-ভোজনবৃত্তান্ত যে সভ্যতার পুরাণ তার অভ্যন্তরে বসে—বিশ্বাস করা শক্ত বটে।

কেউ কেউ বলেন যে, টেলিভিশনে ক্রমাগত দুনিয়ার দুঃসংবাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, লড়াই প্রভৃতি দেখে দেখে পাশ্চাত্ত্য মানুষের সংবেদনশীলতায় জাড্য এসে গেছে, সংবাদচিত্রে দূরের মানুষের দুঃখ আর তার মর্মে প্রবেশ করে না, প্রকৃত যুদ্ধের শট্-কে বানানো ফিল্ম মনে হয়। এই জড়তা অবশ্য নিয়মিত সংবাদপত্র-সেবনেও আসে, তবে ছাপার অক্ষরের চেয়ে টেলিভিশনের মত দৃশ্যগত মাধ্যমের প্রভাব যে বেশি হবে তা বোঝার জন্য পেশাদার মনোবিজ্ঞানী হবার দরকার নেই। পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, অশ্লীলতা বা হিংসাদৃশ্যের প্রদর্শন সম্পর্কে উদ্বেগও অনেকটা এই কারণেই বটে।

নাবালক-সাবালক উভয় দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত-গুলি এইরকম। প্রথমত, টেলিভিশনের পর্দায় যৌন আবেদন ছোটদের মনে নরনারীর প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তি অবশ্যই সৃষ্টি করে। এবং এ আবেদন সৃষ্টির প্রধান আঙ্গিক যেহেতু মেয়েদের ন্যাকা, বোকা এবং পাকা সাজানো, সেহেতু এক দিকে ছোট মেয়েরা আচরণের আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, অন্য দিকে ছোট ছেলেরা নারীজাতি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা পোষণ করতে শেখে ('মেয়ের হাসির বিষয়')। এখানে আমরা একটা বিরাট বিষয়ে পদার্পণ করছি—সীরিয়াস আর্টের সততার কথা অবশ্যই বলছি না, জ্ঞানপাপীদের দ্বারা পরিচালিত সুড়সুড়ির কথাই বলছি। এই সুড়সুড়ির সমস্যা বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, সাহিত্যেও আছে, কিন্তু টেলিভিশন যেহেতু গৃহাভ্যন্তরস্থিত এবং ছোটদের কাছে তার আবেদন যেহেতু সাংঘাতিক, তাই শুচিবায়ুগ্রস্ত না হয়েও স্বীকার করা যায় যে, টেলিভিশনের মাধ্যমে এই সুড়সুড়ির প্রচার ভাববার বিষয়। চতুর্দিকে যৌন উত্তেজনার উপাদান, অথচ বাস্তব

জীবনে নন্দিত সংরাগের অভাব—এ তো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একটি সুবিদিত সংকটই বটে।

দ্বিতীয়ত, দুঃখদারিদ্র্য ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ছবি দেখলে অধিকাংশ লোকই এখনও বিচলিত হয়, কিন্তু যুদ্ধের সংবাদচিত্র বড়দের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ছোটরা, বিশেষত বলতেই হয় ছোট ছেলেরা, অভিনীত লড়াই আর সত্যিকারের যুদ্ধ দুটোই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে দেখে। যদি তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, যুদ্ধ ব্যাপারটা নেহাৎ রোমাঞ্চকর অ্যাডভেন্চার নয়, রীতিমত চোখের জলের ব্যাপার, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে—'আরে এ সব বানানো গল্প, এরকম সত্যি সত্যি হয় নাকি?' হয় যে। যুদ্ধহীন দুনিয়া গড়ে তোলা যদি কাম্য হয়, তবে আমাদের উত্তরসূরি এই বালক সম্প্রদায়ের গঠনদায়িত্বে আমাদের ব্যবহারিক কর্তব্য কী?

ব্রিটেনের মত দেশের টেলিভিশন—যা চিন্তাশীল স্বাতকদের দ্বারা পরিচালিত উচ্চবর্ণের একটি প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজের, পৃথিবীর নানা ক্ষতচিহ্ন, অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ,—তা যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী এমন কথা আমি বলছি না; হিংসা বা যৌনতা সম্বন্ধে সমাজে, শিক্ষিত সমাজেও, যে 'double standard' বা পরস্পরবিরোধী দুটি মানদণ্ড অবলম্বন করার প্রবণতা বর্তমান, তার প্রতিফলন টেলিভিশনেও দৃষ্টিগোচর, এ কথাই বলছি। একদলীয় শাসনে বিশ্বাসী না হয়েও বলা যায় যে মানবিক কল্যাণের খাতিরে উপরোক্ত ব্যাপারগুলিতে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

৬

ছোটদের কথা দিয়ে এই প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম, এবং ঘুরেফিরে তাদের কথা বারে বারেই তুলতে হয়েছে। কেন, তা পাঠকদের কাছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। সামাজিক সব প্রতিষ্ঠানই দোষে-গুণে মেশানো, টেলিভিশনও ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু টেলিভিশনের সামাজিক ভূমিকা কিরকম হওয়া উচিত, তার অবাঞ্ছিত প্রয়োগ কিভাবে এড়ানো যায়, এসব বিষয়ে পৃথিবীর সর্বত্র এবং সমাজের সর্বস্তরে বিস্তারিত গঠনমূলক আলোচনা হওয়া দরকার বিশেষত এই কারণেই যে, আমাদের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের উপরে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব পরোক্ষ নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ। শান্তির সময় সৈনিকদের কুচকাওয়াজ যেমন অধিকাংশ নাগরিকদের দৈনিক জীবনে দূরাগত ধ্বনিমাত্র, টেলিভিশন তেমন নয়। টেলিভিশন

ঘরের ভিতরকার জিনিস, ছোটদের খুব কাছাকাছি, প্রাত্যহিক খাবারের থালার মতই তাদের করায়ত্ত। উপরন্তু, স্কুলের থেকে টেলিভিশনের সঙ্গেই তাদের আত্মিক যোগ বেশি। শিশুমানসে স্কুল লেখাপড়ার পরিশ্রমের, নিয়মানুবর্তিতার অনুষঙ্গে বাঁধা, কিন্তু টেলিভিশন শাসনমুক্ত 'home sweet home'-এর এবং ছুটির হুল্লোড়ের অনুষঙ্গে রাজকীয়। তারা সবাই রাজা তাদের এই রাজার রাজত্বে।

তা ছাড়া সমস্যাগুলি পশ্চিমে সীমাবদ্ধ থাকবে না, থাকতে পারে না। টেলিভিশনের ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। ইংরেজী বাগ্‌ধারার অনুসরণে বলা যায় যে, সে চলে যাবার জন্য আসে নি, থাকতে এসেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বাড়বে এবং যন্ত্র হিসাবে তার নব নব উন্নততর রূপ দেখা দেবে। ইলেক্‌ট্রনিক দুনিয়ায় বিপ্লবের ফলে অত্যন্ত জটিল বৈদ্যুতিক সার্কিটকেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বাঁধা যাচ্ছে। পকেট-সাইজ টেলিভিশন এখনই লভ্য, অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে টেলিভিশনকে ঘড়ি বা আংটির মত কব্জিতে বা আঙুলে ধারণ করা যাবে। তা ছাড়া আছে দেয়াল-জোড়া পর্দায় ত্রিমাত্রিক টেলিভিশনের সম্ভাবনা। বিশেষ-গুণ-সমন্বিত আলোর উৎস লেসার (Laser)-এর উদ্ভাবনের ফলে হলোগ্রাম (hologram) নামে এক জাতীয় আলোকচিত্র তৈরি করা যাচ্ছে, যা থেকে প্রকৃত ত্রিমাত্রিক ছায়াচিত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। আগে যেগুলিকে ত্রিমাত্রিক আলোকচিত্র বলা হোতো সেগুলি বস্তুত নির্ভর করতো দৃষ্টিবিভ্রমের উপর। কিন্তু হলোগ্রাম ঠিক সেভাবেই আলো বিকিরণ করে যেভাবে করে কোনো বাস্তব সামগ্রী, ফলে ঘনত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত সত্যিই দৃষ্টিগোচর হয়। হলোগ্রাফিক টেলিভিশন এখনও নির্মিত হয় নি বটে, কিন্তু গবেষণা চলছে, এবং অদূর ভবিষ্যতেই নিশ্চিত এর দেখা মিলবে। তখন ফুটবল খেলোয়াড়েরা প্রায় দর্শকের ঘরের গালিচাতেই নেমে পড়বেন; ছায়াময়ী চিত্র-তারকারা প্রায় ভক্তদের সোফা ঘেঁষেই হেঁটে যাবেন, বিজ্ঞানের মায়ার খেলায় জীবন ও টেলিভিশন একাকার হয়ে যাবে।

উপরন্তু, কোনো কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে এবং দর্শকেরা নিষ্ক্রিয়-ভাবে বসে বসে দেখছেন, টেলিভিশনের এই যে বর্তমান রূপ, এটাও বদলাতে বাধ্য। ভবিষ্যতে আসবে টেলিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণ ও সংযুক্ত টেলিফোন-টেলিভিশন। ছোট ছোট গোষ্ঠীকে ভিত্তি করে এই আদানপ্রদানের জালবুনট স্থাপিত হতে পারবে, যার সাহায্যে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে

ভাববিনিময় করতে পারবেন। রাজনীতিবিশারদ ও ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক সভাও এ মাধ্যমেই সম্ভব হবে। টেলিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলে সমাজের একটি বিশেষ লাভ হতে পারে। দলীয় স্বার্থকে কায়েম করার জন্য বা কোনো এক-তরফা প্রচারের জন্য এই শক্তিশালী মাধ্যমটির একচেটিয়া ব্যবহারের সম্ভাবনা বিনষ্ট হবে এবং টেলিভিশন সত্যিই জনগণের মধ্যে আদানপ্রদানের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারবে।

সাধারণ ক্যামেরা ও ক্যাসেট টেপরেকর্ডারের মত টি-ভি ক্যামেরা ও ভিডিও-টেপরেকর্ডার (videotape-recorder)-এর প্রচলন এখনই ক্রমবর্ধমান। কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানকে রেকর্ড করে রেখে পরে দেখা তো সম্ভবই, বাড়িতেই টি-ভি ফিল্ম তৈরি করা ও দেখাও সম্ভব। যদিও এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখন পর্যন্ত মুখ্যত শিক্ষাজগতেই আবদ্ধ, তবুও উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সার্কিটের প্রচলনের ফলে এদের দাম বছর বছর কমে যাচ্ছে এবং ক্রমশ সাধারণ নাগরিকের আয়ত্তে চলে আসছে। এ উৎপাদনে জাপান অগ্রণী তো বটেই, তৃতীয় দুনিয়াতেও এসব ইলেক্‌ট্রনিক শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল।

অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে, এ ক্ষেত্রে বেতারের ভবিষ্যৎ কী? তার জবাবে বলতে হয় যে, বেতারের ব্যবহার একেবারে উঠে যাবে না, সংকুচিত হলেও থাকবে। তার কারণ বেতারের কতগুলি নিজস্ব সুবিধা আছে। উদাহরণস্বরূপ, কাজ করতে করতে বা গাড়ি চালাতে চালাতে বেতারের কার্যক্রম শোনা সম্ভব, যা দৃশ্যগত মাধ্যমের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাছাড়া সংগীতের প্রচারে বেতারের বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। লঘু সংগীত এবং উচ্চ মার্গের সংগীত, দুই জাতের সংগীতের প্রচারেই বি-বি-সি-র বিখ্যাত বেতারবিভাগ এখনও টেলিভিশন-বিভাগের অগ্রবর্তী। আর যাঁরা চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন তাঁদের বলতে হয় যে, টেলিভিশনের সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী। গুণী পরিচালকেরা টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্যই ছায়াচিত্র তৈরি করবেন—টেলিভিশনের জন্য তৈরি ইংগ্‌মার বের্গমানের ছায়াছবি আমি নিজেই দেখেছি। তা ছাড়া গোষ্ঠীভিত্তিক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ভিডিওটেপরেকর্ডারের বহুল প্রচলন ঘটলে সাধারণ নাগরিকেরাই নানান ধরনের ফিল্ম নির্মাণে নেমে পড়বেন। ধনিকশ্রেণীর মালিকানায় বৃহৎ উৎপাদনের অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে চলচ্চিত্রনির্মাণ চলে আসবে ঘরোয়া পরিবেশে। সিনেমাহলও গোষ্ঠী-কর্তৃক সমবায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারবে। এসব ব্যাপারে কোনো সমাজে গুণের অভাব থাকে না, অভাব

থাকে সুযোগের। প্রকৃত গণমাধ্যম হয়ে সেই সুযোগকে সাধারণ্যে বিকীর্ণ করে দেবার ক্ষমতা টেলিভিশনের আছে।

প্রয়োগবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ভাবীকালের টেলিভিশন কম্‌পিউটার-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঘরে ঘরে বিশ্বকোষের মত জ্ঞান বিতরণ করতে পারবে। বলা বাহুল্য, খবরের কাগজের বদলে টেলিভিশনই প্রধান সংবাদদাতা হয়ে উঠবে; সাম্প্রতিকতম খবরের হেডলাইন তথা অনুপুঙ্খগুলিকেও বোতাম টিপে টেলিভিশনের পর্দায় আনা যাবে। সাংবাদিকতা উঠে যাবে না, কিন্তু কাগজকে আশ্রয় না করে হবে টেলিভিশন-আশ্রয়ী। তেমনি বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও টেলিভিশনের বহুল প্রয়োগ অবধারিত।

সংক্ষেপে, শিক্ষায়, সাংস্কৃতিক জীবনে, সুরুচিসম্পন্ন প্রমোদ পরিবেশনে, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সমন্বয়জাত এই বহুমুখী মাধ্যমটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবান্বিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

বাণিজ্যচিন্তা

রুগ্‌ণ শিল্প

বিচিত্র গুপ্ত

নতুন কিছু দেখলে তার অভিনবত্ব অস্বীকার করার প্রয়াসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলি, এ আমাদের 'বেদে' আছে? প্রায় সব কিছুরই নজির মেলে আমাদের বেদে আর পুরাণে। কাজে কাজেই 'রুগ্‌ণ শিল্পের (sick industry) কথা শুনলে আমাদের মনে পড়ে যায় পুরাণের একটা গল্প। খুব পরিচিত একটা গল্প—সমুদ্র-মন্থনের গল্প।

সংক্ষেপে গল্পটার পুনরাবৃত্তি করা যাক। দেবতারা আর অসুরেরা সমুদ্র-মন্থনে নামলেন। বাসুকী নাগকে দড়ি-করা হোল—একদিকে দেবতারা আর অন্যদিকে অসুরেরা। একে একে সমুদ্র থেকে উঠে এলো ঐরাবত, অশ্ব এবং মহালক্ষ্মী। যা আসে সব দেবতারা একে একে নিয়ে চলে যান। অমৃত উঠলো, তাও দেবতারা নিয়ে গেলেন, অসুরদের কপালে ছিঁটেফোঁটাও জুটলো না। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে ঘোর অশান্তি—যুদ্ধবিগ্রহও হোল। কিন্তু অসুরদের ভাগ্য ফিরলো না। অবশেষে বাসুকীর মুখ থেকে বেরুলো গরল। গরল কেউ নিতে চান না—দেবতারাও না, অসুরেরাও না। আবার গরল সম্বন্ধে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতেও পারেন না। ভয়, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কী করা যায়? ডাকা হোল দেবাদিদেব মহাদেবকে। তিনিই সেই বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করলেন। তাঁর নাম হোল 'নীলকণ্ঠ'।

আজকের শিল্প পটভূমিতে এই সমুদ্র মন্থনের গল্প বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। ধরা যাক, সমুদ্র মন্থন একটা শিল্প-প্রকল্প যার এক দিকে আছেন বুদ্ধিজীবীরা—যাঁরা হলেন দেবতা আর অন্য দিকে শ্রমজীবীরা যাঁদের

আমরা অসুরের রূপে দেখছি। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যখন লাভ বা সুফল দেখা যায়, তখন তা আত্মসাৎ করতে দুপক্ষই আগ্রহী হন। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা লাভের বেশির ভাগ অংশটাই আত্মসাৎ করতে তৎপর হন। আর শ্রমজীবীরা চেষ্টা করেন সেই লভ্যাংশে তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে। এই ভাগাভাগি নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ অশান্তি এবং আইনী বে-আইনী লড়াই। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে বা অন্য কোন সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে সেই শিল্প যখন লাকসানের সম্মুখীন হয়, তখন সেই ক্ষতিকে স্বীকার করে নিতে কোন পক্ষেরই আর আগ্রহ থাকে না। এদিকে আবার ক্ষতির পরিমাণকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতেও দেওয়া যায় না। শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক কারণে বন্ধ করেও দেওয়া যায় না। তাই ডাক পড়ে শিবঠাকুরের। এ যুগের শিবঠাকুর হলেন সরকার —কোন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আর কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারকে বলা হয় নীলকণ্ঠের ভূমিকা পালন করতে। সরকার যেন লোকসানের দায়িত্ব নিয়ে নেন—সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য।

এ রকম নজির দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে। কারখানা থেকে যখন প্রচুর লাভ হয়েছে তখন কোন পক্ষই সরকারকে ডাকেন নি। মালিকেরা বাড়িয়ে নিয়েছেন নিজেদের সমৃদ্ধি আর শ্রমিকেরা দাবি করেছেন বেতন বৃদ্ধি এবং আরও বেশি হারে বোনাস। তখন সরকারের কথা কারুর মনে পড়ে নি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকারের ন্যায্য পাওনা সরকারকে দেওয়া হয়নি।—যেমন আয়কর ফাঁকি, সেল্‌স্ ট্যাক্স্ ফাঁকি ইত্যাদি, ইত্যাদি। শিল্প প্রতিষ্ঠানে যখন অসুস্থতা আসে, তার পরিচালক গোষ্ঠী তখন দেখেন এক নূতন সুযোগের সন্ধান। তাঁরা ভাবেন, যদি সরকারের ঘাড়ে বকেয়া লোকসান আর প্রাপ্য ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে জালমুক্ত হতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো লাভে সরকার হাত দিতে না পারেন, তাহলে সমুদ্র মন্থনের অমৃতের সবটুকুই তাঁরা নিশ্চিন্তে ভোগ করতে পারেন। অন্যদিকে সরকার পড়েন সংকটে। যে কোন কারণে কোন কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে অনেক শ্রমিক কর্মচারী হয়ে যাবেন বেকার। সামাজিক পরিস্থিতিতে দেখা যাবে নানা রকমের অশান্তি। কাজেই কোন দায়িত্বশীল সরকার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন না।

গত আট দশ বছরে দেশের শিল্পে রুগ্‌ণতা বা অসুস্থতা একেবারে মড়কের মত দেখা গেছে। আগেও যে অর্থের অভাবে, কাঁচা মালের অভাবে ও বিক্রয় ব্যবস্থার অবনতির ফলে বা এ রকম অন্য কোন কারণে যে কলকারখানা বন্ধ

হয়ে যায় নি তা নয়। কিন্তু তখন সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হোত এবং তার মধ্যে সমাজ বা সরকারকে জড়ানো হোত না। কিন্তু এখন আর রুগ্ন শিল্পকে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয় কেননা আজ কোন কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফল অনেক গভীর এবং অনেক ব্যাপক।

দেশের আইন-কানুন, অর্থনীতিক কাঠামো, সমাজব্যবস্থা এসব নিয়েই আমাদের শিল্প-জীবনের পটভূমি। এর কোনটিকেই বাদ দিয়ে শিল্পে অসুস্থতা দূরীকরণের কথা ভাবা যায় না। অর্থাৎ, এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই সবদিক থেকেই দৃষ্টিপাত করতে হবে। কেবল একদিক থেকে দেখলে, সমস্যার সমাধান না হয়ে অন্য রকমের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজকে কেবল গরলের হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে সরকার হয়তো পরিস্থিতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন—তাতে কিন্তু শুধু একপক্ষ নিশ্চিন্ত মনে অমৃত ভোগ করার সুযোগ পাবে। এরকম সম্ভাবনাকে এড়ানোর উপায় কি? অনেক হতাশ ব্যক্তির কাছে শুনতে পাই আমাদের দেশের আইন কানুনগুলি এমন যে তাতে পুষ্ট লোকেরই বেশী সুবিধে হয়। ন্যায় বিচার পেতে অনেক সময় লাগে এবং অনেক সময় তা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। তহবিল তছরূপ, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি এরকম ঘটনার কথা আমরা অনেক শুনতে পাই। কিন্তু ঐ অপহৃত অর্থ সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এরকম কথা বড় একটা শুনতে পাই না। কিন্তু কেন? কেউ বলেন উপযুক্ত প্রমাণপত্রের অভাব, কেউ বলেন আইনে ত্রুটী আবার কেউ বলেন, আমাদের বিচারব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু গলদ আছে যার ফাঁক দিয়ে অপরাধী ব্যক্তিরা বুদ্ধির কৌশলে বেরিয়ে এসে অনায়াসে অপরাধ-লব্ধ ফল ভোগ করতে পারেন। শিল্পক্ষেত্রেও দেখা গেছে, শ্রমিকেরা কর্মচ্যুত হয়েছেন, ছোট অংশীদারেরা তাঁদের খাটানো টাকা খুইয়েছেন, কিন্তু কয়েকজন অতি কৌশলী শিল্পপতি দিব্য আরামে বাড়ী, গাড়ী, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি ক'রে গেছেন। (এ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও এবং তথাকথিত অনেক সভ্যদেশেও এরকম অঘটন ঘটেছে)। এই অতিকৌশলী ব্যবসায়ীরা আইনের লম্বা বাহুর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। কাজেই সরকার যখনই কোন একটি রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে হাতে নেবেন বলে ঠিক করলেন তখনই প্রথম কাজ হবে আইনের দিকটা একটু ভেবে দেখা। দেখা দরকার অমৃতভোগী দেবতাদের কাছ থেকে ভুক্তবিশিষ্ট অমৃতের ছিটে ফোঁটাও উদ্ধার করা যায় কিনা। প্রয়োজন হলে আইনের সংশোধন করতে হবে—বিচার ব্যবস্থাকে সংগঠন-সিদ্ধ উপায়ে পুনর্বিন্যাস করতে

হবে। এর সুফল দুটি—এক, রুগ্ন শিল্পের চিকিৎসার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা এর থেকে কিছুটা আসবে। দুই, এতে অপরাধ-প্রবণ দেবতাদের আচরণ পরিবর্তন আসবে। এঁরা ইচ্ছাকৃত উপায়ে শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিল্পকে রোগগ্রস্ত করা থেকে বিরত হবেন।

দেবতাদের কথা হোল—এবার অসুরদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। শ্রমিকদের অতিরিক্ত দাবীদাওয়ার ফলে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান অসুস্থ হয়েছে এরকম কথাও আমরা শুনেছি। কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে আমাদের দেশের শ্রমিক-শ্রেণী দায়িত্ব-সম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নি। শ্রমিক আন্দোলনের উত্থান-পতন নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে অনেকে রাজনীতির খেলা দেখেছেন, অনেকে আবার সংঘর্ষের পেছনে দেখেছেন মালিকেরই কালো হাত। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করার অবকাশ নেই। কেবল যা একান্ত প্রাসঙ্গিক তারই উল্লেখ করা হচ্ছে।

বিগত কয়েক বছরে শ্রমিক সংক্রান্ত অনেক আইন জারী করা হয়েছে এবং অনেক আইনের সংশোধনও করা হয়েছে। এই সব আইনগুলো প্রবর্তন করার সময় একটা দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছে যাতে শ্রমিকশ্রেণী "স্বাভাবিক বিচার' (natural justice) পান, অর্থনৈতিক বিচার (economic justice) পান, সামাজিক বিচার (social justice) পান এবং অন্য আর কোন বিচারের কথা যদি কল্পনা করা যায় তা যেন সব তাঁরা পান। (বাস্তবে শ্রমিকেরা কতটা সুবিচার পেয়েছেন তা এখানে তর্কের বিষয় নয়।)—কিন্তু ঠিক এই বিচারগুলি নিয়োগ-কর্তা (employee) পাবেন কিনা তা ঠিক করা হয়নি। ফলে বিচারের মানদণ্ডে ভারসাম্যহীনতা দেখা গেছে। অনেকে পরিহাসের ছলে বলেছেন—পৃথিবী থেকে ক্রীতদাস প্রথা চলে গেছে কিন্তু 'ক্রীত-মালিক' প্রথা এসেছে তার জায়গায়। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন—একবার যদি কোন লোককে চাকুরীতে বহাল করা হোল, তো মালিকের employer) আর নিস্তার নেই। এই চাকুরীপ্রাপ্ত লোকের হাত থেকে মালিক আর কোন মতেই মুক্তিলাভ করতে পারেন না। বা মুক্তি পেতে হলে তাঁকে বেশ চড়া দাম দিতে হয়। কাজের অনুপযুক্ত হলে বা লোক বাড়তি হলে এঁদের কমানো সম্ভব হয়নি। যেখানে শ্রমিক-ইউনিয়ন খুব শক্তি-শালী, সেখানে ইউনিয়ন থেকে বাধা এসেছে। সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সমস্যার দিকে তাকানো হয়নি। যদি সংগঠনকে সৃজনশীল করে আপোষের মনোভাব

নেওয়া হোত, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পে অসুস্থতা এড়ানো যেত। এসব ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত সংস্থায় সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার শ্রমিকদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থহীন সংগ্রামশীলতার পরিবর্তে আপোষধর্মী মনোভাব। এক কথায় দরকার মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কের মধ্যে 'সমঝোতা' মূলক আবহাওয়া। এই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ভাল না হলে বাকী আর সব সংশোধনী ব্যবস্থাগুলো ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এবার আসা যাক ঐসব বিষয়ে চিন্তা যা দেবতা বা অসুরদের ও নাগালের বাইরে। ধরা যাক, একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছিল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। তৎকালীন বিজ্ঞান-কারিগরী (technology), বাজারের চাহিদা (market demand), কাঁচামালের প্রাপ্যতা বা এই সব সূত্র, যা ধরে এই কারখানাটি তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে, বাজারের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে এবং কাঁচামালের প্রাপ্যতার পরিস্থিতি বদলে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাবে একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটার সঙ্গে আরেকটার কোন সম্পর্কই নেই। আবার ক্ষেত্র বিশেষে এমনও দেখা যাবে যে অন্য জায়গা থেকে পরিবর্তনের ঝাপটা এসে পরোক্ষভাবে এই কারখানাটিকে আক্রমণ করেছে।

উপরোক্ত কারণগুলোর মধ্যে প্রথমে আসা যাক্ বিজ্ঞান-কারিগরীর প্রশ্নে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগকুশলতার উন্নতি হয়েছে। নূতন উদ্ভাবনের ফলে আগের কর্মপদ্ধতি এখন অনুপযোগী (obsolete) হয়ে পড়েছে। তাই প্রয়োজন যুগোপযোগী নূতন যন্ত্রপাতি, নূতন কর্মপদ্ধতি। কথাটা বলা যত সহজ, কাজটা করা কিন্তু তত সহজ নয়। নূতন যন্ত্রপাতি আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ হয়তো না-ও পাওয়া যেতে পারে। নূতন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত লোকের অভাব হতে পারে। আবার এও হতে পারে, কাগজে কলমে দেখানো হোল নূতন যন্ত্রপাতি বসালে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা (capacity) এবং কর্মকুশলতা (efficiency) বাড়বে, কিন্তু ঐ বাড়তি উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করার ক্ষমতা বাজারের নেই। এর ফলে বিজ্ঞানের উন্নতিকে কাজে লাগাবার সুযোগ খুবই সীমায়িত হয়ে যাবে। বেশী টাকা খাটাতে হবে বলে ব্যবসায়ীরা প্রগতির সুযোগ নেন নি। আবার অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুযোগ নিতে বেশী পরিমানে যান্ত্রিকতা প্রবর্তন করতে হবে যার ফলে অনেক কর্মচারী 'অপ্রয়োজনীয়' বলে পরিগণিত হবে। তাই ছাঁটাই-এর ভয়ে শ্রমিকশ্রেণী আধু-নিকীকরণের বিরোধিতা করেছেন। প্রগতি সম্বন্ধে মালিক ও শ্রমিক দুই-

পক্ষেরই মনোভাবের কথা বলা হোল। কোন পক্ষেরই অনমনীয় মনোভাব নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার চাহিদা ও রুচি বদলায়। আবার বাজারে বিকল্প বস্তু পাওয়ার জন্য ক্রেতা আগে যা কিনতেন তা কেনা ছেড়ে দেন। এর উপর আছে ক্রয় ক্ষমতার কথা আছে। ক্রেতা যেমন একটি জিনিষ ছেড়ে অন্য আরেকটি জিনিস ধরেন, তেমনি একটি জিনিষকেও এক ক্রেতা ছেড়ে অন্য ক্রেতার কাছে বিক্রী করতে হয়। কোন পণ্যসামগ্রী হয়তো একদিন শহরের গ্রাহকদের প্রিয় ছিল, কিন্তু আজ তা শহরের লোকের রুচিমাফিক হচ্ছেনা। চেষ্টা করলে তা হয়তো অন্য ছোট ছোট শহরে বা গ্রামে চালানো যেতে পারে। অথবা কারখানার যন্ত্রপাতিকে ভিন্নরকমের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা নির্ভর করবে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়ের উপর যেমন বর্তমান যন্ত্রপাতি, জমি ও অন্যান্য উৎপাদনের ব্যবস্থা, কতটা পরিমাণে এই যন্ত্রপাতিগুলো আধুনিকীকরণের উপযোগী এবং বিকল্প পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাব্যতা।

প্রধানত কাঁচামালের প্রাপ্যতাকে ভিত্তি করেই কলকারখানার অবস্থান ঠিক করা হয়। (অবশ্য আরও অন্যান্য কারণে একটা কারখানার স্থান নির্বাচন করা হয়)। কাঁচামালের অভাবে অনেক সময় কারখানা চালানো কষ্টকর হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধ করে দিতে হয়। কারখানা আরম্ভ করার সময় গ্রহণযোগ্য কাঁচামালের গুণাগুণ (specifications) স্থির করা হয়। পূর্বের গুণাগুণ মিলিয়ে কাঁচামাল নাও পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কাঁচামাল নিয়ে উৎপাদন পদ্ধতিতে কিছু রদবদল করে কারখানা চালু রাখা যায়। অথবা বিকল্প কাঁচামাল দিয়েও হয়তো কাজ চালানো যেতে পারে।

কারিগরী পরিস্থিতি, বাজারের চাহিদা ও কাঁচামালের প্রাপ্যতার পরেই উল্লেখ করতে হয় প্রয়োজনীয় অর্থের কথা। রুগ্নশিল্পের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন, ব্যবস্থাগুলো কার্যকর (implement) করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কারখানাকে আর চালু করা গেল না। এ যেন রোগ নির্ণয় হোল, উপযুক্ত ওষুধের ব্যবস্থাপত্রও পাওয়া গেল, কেবল টাকার অভাবে ওষুধ কেনা হোল না বলে রুগী মারা গেল। তবে আশার কথা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকার অর্থের অভাবে এরকম অপমৃত্যু ঘটতে দিচ্ছেন না। জাতীয়করণের আওতায় যে সব ব্যাংকগুলো এসেছে তাদের কাছ থেকে সহযোগীতামূলক সাড়া অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে।

সব কিছু জোগান দেওয়ার পর শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা (management)। পরিচালননীতিতে চাই সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী। পরিচালননীতিতে গলদ থাকার জন্য কি ভাবে একটি প্রতিষ্ঠান রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত হোল পশ্চিমবঙ্গেরই এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একদা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক কারখানা হিসেবে পরিগণিত হোত। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের দুটি কারখানা এবং দু জায়গা মিলিয়ে সব রকম রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করা হোত। ভারী শিল্প (Heavy chemicals) হিসেবে সালফিউরিক এসিড, ফিটকারী এবং আলকাতরা শোধন (Tar distillation)। আবার সূক্ষ্ম শিল্প (Fine chemicals) হিসেবে ওষুধপত্র এবং তারপর তেল, সাবান ও গন্ধদ্রব্য। শেষ পর্যন্ত আয়ুর্বেদিক ওষুধও বাদ যায়নি—যেমন মকরধ্বজ ইত্যাদি। বর্তমান যুগের অর্থনীতিক পটভূমিতে সবকিছু করা সম্ভব নয় এবং লাভজনক নয়। এযুগ বহুল পরিমাণে বৈশিষ্ট্যের (specialisation) যুগ; তাই এখন কয়েকটি বিশেষ পণ্য সামগ্রীকে বেছে নিতে হবে। এ হোল পরিচালন নীতির মাত্র একটি দিকের কথা। এছাড়া আরও অনেক দিক আছে—যেমন সংগ্রহণ নীতি (Procurement Policy), দ্রব্য সামগ্রীর মজুত নীতি (Inventry Control Policy), ঋণনীতি (Credit Policy) ইত্যাদি। এইসব এবং আরও অনেক কিছু মিলিয়েই পরিচালন নীতি যার মধ্যে বিচক্ষণতা ও সুষ্ঠুতা একান্ত আবশ্যক।

রুগ্ন শিল্প নিয়ে অনেক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে তা আর উল্লেখ করা হোল না। বর্তমান আলোচনায় রুগ্ন শিল্পের কয়েকটি দিকে আলোকপাত করা হোল। যে সব কারণগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও অনেক কারণে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান রোগগ্রস্ত হতে পারে যেমন বিদ্যুৎ ঘাটতি, উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। স্বয়ংসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। তাই খোলা মন নিয়ে একটি রুগ্নশিল্পকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সম্ভবপর সব দিক থেকে একে দেখতে হবে। আর যাঁরা প্রকৃত শিল্প পরিচালন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যাঁদের সার্বিকভাবে একটা শিল্পকে দেখার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা আছে কেবল তাঁদেরই দেওয়া উচিৎ এইসব রুগ্নশিল্পকে পুনরুদ্ধার করার ভার।

বিশেষ রচনা

কি পড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কোনদিনই নিয়ম বেঁধে কোনো পড়াশুনো করিনি। শিশুবয়সেই যখন বড়দের পত্রপত্রিকা বা গল্প উপন্যাস গো-গ্রাসে গিলতাম তখনো কেউ কিছু বারন করেনি। ঐ একটা ব্যাপারে বরাবর স্বাধীনতা ছিল।

পাশ করা আর পড়াশুনো করা এক জিনিস নয়। আমাদের পরিবারে পাশ করা লোকের অভাব ছিল না, তবে পাশ করার পর গুরুগম্ভীর কেতাব নিয়ে কাউকেই পড়ে থাকতে দেখিনি। তবে যে কোনো বই হাতের কাছে পেলে সেটা নিয়ে ডুবে যাওয়ার অভ্যাস আমার বাবার এই বুড়ো বয়সেও আছে। খানিকটা আমারও হয়েছে। পাঠাভ্যাস মায়েরও আছে। তবে তার বড় অংশই ধর্মগ্রন্থকেন্দ্রিক।

ধর্মগ্রন্থ, কি জানি কেন, বরাবর আমাকে আকর্ষণ করে। তা বলে এ নয় যে, আমি সব ধর্মগ্রন্থ গুলে খেয়েছি। চন্দনচর্চিত ও ফুল বেলপাতায় আবৃত মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য খানাকে মা ঠাকুরের সিংহাসনে রেখে দিয়েছিলেন। ওটিকেও ধর্মগ্রন্থ বলে বরাবর মনে হয়েছে। সেই স্বার্থকে পূজোর বন্ধন থেকে উদ্ধার করে পড়ে ফেলেছিলাম। পড়ার পর সেটিকে আর ধর্মগ্রন্থ বলে ভুল হয়নি।

ইদানীং আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুরা মাঝে মাঝে অনুযোগ তোলেন, আমি নাকি তেমন সিরিয়াস পড়াশুনো করি না। কথাটা বেঠিক নয়ও। বাস্তবিক আমি সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি বা এমন কি ধর্ম সম্বন্ধেও খুব বেশী পড়ে উঠতে বা বুঝে উঠতে পারি না। তার কারণ, প্রায় সর্ববিষয়েই এত মতান্তর ও

মতবিরোধ যে আমি কিছু ক্লান্তবোধ করি। কি জানি কেন, দুনিয়া শুদ্ধু মানুষের মতামত জানবার আগ্রহও আমার বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এমন কি উপন্যাস বা গল্প পড়তে গিয়েও ঠিক মনোমতো না হলে আধ-পড়া অবস্থায় ছেড়ে দিই। আশ্চর্যের বিষয়, আবার কখনো খুব খারাপ, হাস্যকর বা বিরক্তিকর বা জঘন্য ধরনের কোনো খারাপ লেখাও বারবার পড়ে ফেলি। কতটা খারাপ, কেন খারাপ, কোথায় দুর্বলতা বা অক্ষমতা তার চুলচেরা বিচার করার এক একটা আগ্রহ থেকেই এটা ঘটে।

পাঠ্য-বহির্ভূত প্রথম ইংরিজি বই পড়েছিলাম আঠারো কি উনিশ বছর বয়সে। ন্যুট হামসুনের 'প্যান' উপন্যাসটি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই। আর তার পর থেকেই বিদেশী সাহিত্য পড়ার ঝোঁকটা এল। আগেই বলেছি আমার পড়ার কোনো রীতি নিয়ম নেই। হাতের কাছে যা পাই পড়ি। বঙ্কিম-রবি ঠাকুর-শরৎ-বিভূতি-তারাশংকর-মানিক-মহাস্থবির-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র পড়া শুরু হয়েছিল প্রায় ছেলেবয়সে। কুড়ি একুশ বছর বয়সে সাহিত্যের নতুন দিগন্ত খুলে-দিলেন ডস্টয়েভস্কি। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ভিতরটা টালমাটাল হয়ে গেল। তারপর থেকে মোটামুটি বিশ্বখ্যাতদের রচনা পড়ে আসছি, কিন্তু উত্তম নিয়ে পুথিপত্র যোগাড় করা হয়ে ওঠে না, হাতের কাছে পেলে ভোজে বসে যাই।

আমার বইয়ের সস্তা র‍্যাকে দু খণ্ড কালো মলাটের ডাস ক্যাপিট্যাল রয়েছে আজ বহুকাল ধরে। ভয়ে তা খোলা হয়নি আজও। উইল ডুরান্টের সুখপাঠ্য পেপারব্যাক থেকে শোপেনহাওয়ার সম্পর্কে আমার যা জ্ঞানগম্যি। আমার ঠাকুর বলেন, কোনো কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্পর্কে জ্ঞানই হয় না। তুমি যাই দেখনা কেন তার মধ্যে সত্য দেখতে চেষ্টা করো। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা। যা তুমি জাননা এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। আবার এও বলেছেন, সত্যদর্শীর আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা কর এবং বিনয়ের সঙ্গে স্বাধীন মত প্রকাশ কর। বই পড়ে বই হয়ে যেও না। pull the husk to draw the seed. আবার বলেছেন, অনুভূতির দ্বারা যা জানা যায় তাই জ্ঞান। জ্ঞানের মতো আর দৃষ্টি নেই। জ্ঞানকেই বেদ বলে। যে যতটুকু জানে সে ততটুকু বেদবিৎ। যার বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই। আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের?

এই অনুভূতির কথাটা আমার বড় প্রিয়। যতক্ষণ বই আমার অনুভূতিকে

শানিয়ে তোলে ততক্ষণই তা আমার প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। যখন তা করেনা তখনই আমি সেই বইয়ে বিমুখ হই।

এইখানে সবিনয়ে স্বীকার করি, আমার কৈশোর যৌবনের সন্ধিতে একধরণের গ্রন্থপাঠে আমার ঝু-অভ্যাস জন্মায়। সিগারেট বা নস্যি বা মদের নেশার মতো অভ্যাস। কিছুতেই ছাড়তে পারিনা। সেই অভ্যাস হল গোয়েন্দা বা থ্রিলার জাতীয় বই পড়ার? প্রথম এ ব্যাপারে হাতে খড়ি হয় আগাথা ক্রিস্টি পড়ে। তারপর বড় গোয়েন্দা লেখকরা কেউই বাদ পড়েননি। এ ব্যাপারে আমার কিছু বাছাবাছি আছে। অতিরিক্ত মারদাঙ্গা বা রক্তপাতে আকীর্ণ রগরগে বই আমি কদাচিৎ পড়ে শেষ করতে পারি। বোধদীপ্ত বিশ্লেষণ না থাকলে সে বই ছুঁতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, গোয়েন্দা বা থ্রিলার আমার মস্তিষ্কের গভীরে কোনো ক্রিয়া না করলেও ভিতর থেকে মনের অবসাদকে তাড়িয়ে দেয়। অনেক আজে-বাজে চিন্তাকে ফুলোর বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে চারপাশ সম্পর্কে আমাকে কিছু বেশি মনোযোগী করে তোলে। কখনোই অবসর বিনোদনের জন্য আমি থ্রিলার পড়েছি বলে মনে পড়েনা, বরং খুব জরুরি কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনটাকে ঝরঝরে করার জন্যই বরাবর এই সব বই আমি পড়ি।

খুব আস্তে আস্তে পড়ি হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ অনুদিত মহাভারত। র‍্যাগটাইম নামে অসাধারণ একটি গ্রন্থ পড়েছি সম্প্রতি, পাঠ্য তালিকায় আরো আছে হেলীর দি রুটস। রয়েছে ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী। হাতের কাছে অজস্র বই। পড়া বা না-পড়া। বিজ্ঞানবিষয়ক বই আজকাল খুব টানে। হোমিও-প্যাথির একখানা পর্বতপ্রমাণ বই উল্টে-পাল্টে দেখি প্রায়ই। একজন বড় ডাক্তার আমাকে ফিজিওলজি পড়াবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। অপেক্ষায় আছি। বই স্পর্শ করে আছি তবে বইতেই ডুবে নেই। রোজকার নিয়মিত পাঠ্য শ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের গ্রন্থরাজি। অগাধ, অফুরন্ত এক সমুদ্রে স্নানের আনন্দ রয়েছে তাতে। কিন্তু তাঁরই নির্দেশ, অনুভূতির দ্বারা যা জানা যায় তাই জ্ঞান। মাঝে মাঝে বই-পড়া থামিয়ে বাড়ির উল্টোদিকের দেয়ালে সবুজ শ্যাওলায় বেলাশেষের রোদ দেখি। একটা শামুক বুকে হেঁটে উঠেছে অনেকটা, এখনো অনেকটা তবু বাকি। চেয়ে চেয়ে এইসব দেখতে দেখতে আরো অনেক কিছু জেনে যাই। বইতে তো সব নেই। আরো কত বই লেখা হবে।

হিমানীশ গোস্বামী

কিছুনা কিছু পড়তেই হয়—তা সম্পাদক মশাই এবং অন্যান্য সাধু ব্যক্তিরা যাই ভাবুন না কেন। যেমন সকালে উঠেই খবরের কাগজটা, আর কাগজটাই বা বলি কেন, খবরের কাগজগুলি বলাই ভাল। আমাদের সৃষ্ট কাগজটাও পেশাদারী স্বার্থে পড়ার কথা, কিন্তু প্রথমেই খুঁজে বার করার চেষ্টা করি গতকাল যে সব অমূল্য সব সংবাদ লিখে এসেছি সেগুলো সব গেল কোথায়? সে সবের একটিও দেখতে না পেয়ে মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ে, আবার বেশ চমৎকারও লাগতে থাকে, কেননা কোনো শর্মা আর ভুল বার করার পথটি পাবেনা! এই ব্যাপারে আধ ঘণ্টা চলে যায়। তারপর বাজারের থলে হাতে বাজারে বেরিয়ে রীতিমত চমকাতে থাকি আর বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর মুখ আমার মনের আয়নায় এসে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। এরপর বাড়িতে ফিরে কিছুক্ষণ চিৎপাত হয়ে শুয়ে, বিদ্যুৎ থাকলে পাখা চালিয়ে দেয়ালের গায়ে দৈনিক টিকটিকি দেখি, আর ভাবি ওরা বেশ আছে। বিদ্যুৎ না থাকলেও চিৎপাত হয়ে শুয়ে পাখা না চালিয়েই দেয়ালের গায়ে দৈনিক টিকটিকি দেখি, আর ভাবি ওদের মত যদি হতে পারতাম, আহা! দৈনিক টিকটিকি ব্যাপারটা কি তা হয়ত অনেকেই জানেননা। টিকটিকি কয়েক জাতের হয়—এদের কেউ কেউ রাত্রে শিকারে বেরয়, এরা হল নৈশ টিকটিকি, আর রাত্রে বেরিয়েও যাদের খিদে মেটেনি তারা দিনেও বেরয়। এরা হল দৈনিক টিকটিকি। এদের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব হল হল কেউ কোনো কথা বললে টিকটিক করে ওঠা। তবে আজকাল আর টিক-টিকিরা টিকটিক করেনা—ব্যাপারটা কেন হল তা আমার জানা নেই, কেননা জরুরী অবস্থা তো কোন কালেই উঠে গিয়েছে। ওদের এই বাক্ সংযম সত্যিই প্রশংসনীয়।

ঐ যে বলছিলাম, কিছুনা কিছু পড়তেই হয়। খবরের কাগজ দিয়ে দিন শুরু হয়। তারপর সকালের ডিউটি থাকলে চানটান করে দ্রুত কিছু খেয়ে নিয়ে সাট এস ই এ এবং টি দিয়ে কেন লেখা, এস আই টি কি দোষ করল, এবং সোজাসুজি ২৫ না লিখে ২৪+১ কেন লেখা হয় এসব, এবং বাসের বাইরে দুহাজার সাইন-বোর্ডের মধ্যে এক হাজার সাইনবোর্ডই কেন এডিট করা হয়নি এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে অফিসে পৌঁছে যাই। সেখানে কপি-কল থেকে অনর্গল নির্গত মাইলের পর মাইল সংবাদ, সুসমাচার, দুঃসংবাদ এসবও পড়তে হয়। এগুলোও

পড়ার মধ্যে ফেলা যায় কিনা জানি না। পড়তে হলে কেবল বই-ই পড়তে হবে এমন কি কোনো মানে আছে ?

এরপর বেয়ারা একখানা চিঠি রেখে যায়। পোস্টকার্ডে বড় বড় করে লেখা, শালা এখনও সাড়ে তিন টাকা শোধ দিলিনা রে ? ইতি 'ক'। এইরকম করে আমাকে ক জব্দ করে চলেছে। কেন, 'ক' তো আমার বাড়ির ঠিকানা জানেনা তা নয়, সেখানে চিঠি পাঠাতে তো আর খরচ বেশি লাগেনা! এরকম আর দু-চারবার করলেই সাড়ে তিনটাকা 'ক' কে ফেরত দিতেই হবে বাধ্য হয়ে। এই দুর্মূল্যের বাজারে ঐরকম চিঠিপড়ে কান্না পায় আমার। এরকম চিঠি পড়াও বোধহয় পড়ার পর্যায়ে পড়েনা। পড়ার মত জিনিস হল দু মলাটের মধ্যেকার ছাপানো জিনিস। তা গল্প হতে পারে উপন্যাস হতে পারে, হতে পারে ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল। কিন্তু "পাঠ্য পুস্তক" হলে চলবেনা।

কিন্তু পড়তে গেলে দু-মলাটে ভর্তি লেখা হাতের কাছে পাওয়া চাই। এই কারণে, এবং সময়ের দারুণ অভাবে পৃথিবীর প্রায় সব বইই আমার অপাঠ্য থেকে গেছে। পৃথিবীতে রোজ হোক-না-হোক করেও অন্ততঃ হাজার খানা বই বেরুচ্ছে। সঠিক হিসেব জানিনা, তবে পৃথিবীতে ছোটবড় একশো চল্লিশের বেশি রাষ্ট্র রয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্র থেকে প্রতিদিন গড়ে দশটিও যদি বই বেরয় তাহলেইতো দিনে চোদ্দশ বই এর ধাক্কা। সৌভাগ্যক্রমে আমরা মাত্র দুটো ভাষা জানি, বাংলা এবং ইংরিজী, তাতেও দৈনিক শতুয়েক বই নিশ্চয় বেরয়। এ সবই আমার অনুমান। তবে, একদা আমি একটি বিখ্যাত মারকিন বই সংস্থার প্রতিনিধি ছিলাম। বছর পোনেরো আগে ঐ সংস্থা থেকে বই বেরুত দিনে তিনটে করে। এখন ঐ সংস্থা আরও বেশি বই প্রকাশ করে থাকে। এরকম আরও কত প্রকাশক রয়েছে।

যাই হক দিনে দুশো বইও কম কথা নয়। এর মধ্যে, ধরে নিচ্ছি একশো নব্বুইটি বইই আমাদের কাজে লাগবেনা। বহুদিন আগে ওয়েলিংটন-স্কেয়ারে পুরনো বই-এর দোকানে একটা বই দেখেছিলাম মারকিন সেনাবাহিনী কিংবা নৌ-বাহিনী থেকে প্রকাশিত একটা মোটাসোটা ম্যানুয়াল, তার নাম এখনও মনে আছে—হাউ টু বি সেভড ফ্রম এ টরপিডোড বোট। এই বইটির নাম এই জন্যই মনে আছে যে এই রকম বই আমার অন্তত কোনদিনই কাজে লাগবেনা বলে তখন মনে করেছিলাম। এরকম একশো নব্বুইটি বই বাদ দিলে থাকে দশটি বই। দশটির মধ্যে দুটি বাংলা আর আটটি ইংরিজী। এই দশটিই, ধরে নেওয়া গেল,

পড়ার উপযুক্ত। প্রতিটি বই এ গড়ে দুশো পাতা, তাহলে আমার পড়ার উপযুক্ত বই পাতা হিসাবে রোজ প্রকাশিত হচ্ছে দুহাজার।

এ নিয়ে অন্য কিছু বলার আগে চট করে দেখে নিই এই দশখানি বই-এর দাম। আজকাল ইংরিজী বই-এর গড় দাম ত্রিশ টাকা ধরে নেওয়া যায়। এবং বাংলা বই-এর বারো টাকা। তাহলে প্রতিদিন আমার পড়ার মত বই-এর দাম দাঁড়াচ্ছে দুশো চৌষট্টি টাকা। টাকার কথা যখন উঠলই তখন এটা বলে নেওয়া ভাল যে আমার টাকার অভাব না থাকলে এবং রোজ যদি আমি দু হাজার পৃষ্ঠা পড়তে পারতাম তাহলে মাসে আমার বইয়ের জন্য খরচ হত সাত হাজার দুশো টাকা। এর জন্য আলমারি দরকার মাসে গোটা তিনেক করে। মিনিটে এক পাতা করে পড়লে দৈনিক সময় দরকার হত ৩৩ ঘণ্টা। আপনারা সকলেই জানেন একটি দিনে কখনই ৩৩ ঘণ্টা ঠাসা যায়না।

এইবার আসা যাক প্রতিদিন কত সময় একজন বই-এর জন্য পেতে পারে। আমার নিজের কথাই বলছিলাম। সকাল থেকে উঠে বিকেল পর্যন্ত সময় পাইনি, আপনারা দেখেছেন। বাড়িতে ফিরি সন্ধে সাতটায়। তারপর খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করার পর, গল্পটল্প আড্ডা দেওয়ার পর থেকে ঘুমুনো পর্যন্ত সময় থাকে দুঘণ্টা। তার মধ্যে চিঠির উত্তর, টেলিফোন করা, নিজস্ব লেখা ইত্যাদির জন্য সময় দিতে হয় ঘণ্টা খানেক। বাকি থাকে এক ঘণ্টা। এই সময় যদি আমি মিনিটে এক পাতা পড়তে পারি তাহলে সাড়ে তিন দিনে একটা বই শেষ করা যায়, কিন্তু আমি মিনিটে এক পাতা পড়তে পারিনা—আমার সময় বেশি লাগে। ইংরিজী বই-এ সময় আরও বেশি লাগে। তাহলে মাসে সবগুলো বাংলা বই পড়লে আমি পড়তে পারি গোটা ছয়েক বই, আর সবগুলো ইংরিজী বই পড়লে মাসে চার খানার বেশি ইংরিজী বই পড়তে পারিনা।

কিন্তু তাও তো সর্ত সাপেক্ষ। বইগুলোর সঙ্গে পাঠ্য তো আরও কিছু রয়েছে : যেমন দু-একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা, গোটা চারেক মাসিক পত্রিকা, তা ছাড়া আমার আবার দাবার বই দরকার হয়। দাবা সম্পর্কে আমাকে নিয়মিত লিখতে হয় বলে দাবা সংক্রান্ত বই, রিপোর্ট, ম্যাগাজিন এসবও আমাকে দেখতে হয়। এতে আমার পড়ার সময়ের অর্ধেক চলে যায়। কিন্তু তবু দাবার ব্যাপারেও আমি কি খুসি ? মোটেই নয়—গত ৫০ বছরে অন্তত কুড়ি হাজার দাবার বই বেরিয়েছে, সেগুলির মধ্যে আমার রয়েছে মাত্র গোটা পঞ্চাশেক বই।

এবারে আসল কথা বসি। এর আগে যা বলেছি তা কেবলমাত্র অজুহাত। আমি কি কি পড়িনি অথচ পড়া উচিত ছিল তার একটা বড় তালিকা দিতে পারি। টলস্টয়-এর ওয়ার অ্যাণ্ড পীস আমাদের বাড়িতে রয়েছে, তার একান্ন পাতা আমি একুশ দিন খরচ করে একদা পড়েছিলাম, কিন্তু তারপর এগুতে পারিনি। তার প্রধান কারণ ভাষাটা ইংরিজী, আর ঘটনাস্থল বিদেশ। একুশ দিন পড়ার পর আমি দেখলাম আমি ৫১ পাতা পর্যন্ত কী পড়েছি সব ভুলেছি। আবার পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু এবারে দশ পাতা পড়ার পর দেখলাম প্রথমটা মনে পড়ছেনা। আমার ভুলবার ক্ষমতা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই মাঝে মাঝে, কিন্তু টলস্টয় আমার পড়া হলনা। টলস্টয়ের দু-চারটে চমৎকার ছোটগল্প পড়েছি অবশ্যই। মনে পড়ে হাউ মাচ ল্যাণ্ড ডাজ এ ম্যান রিকোয়ার। সাহিত্য পড়েছি। পরে ফল অফ প্যারিস পড়তে গিয়ে এগুতে পারিনি। বড় বড় কোনো বইই আমি আর পড়তে পারিনা। এমন কি রামায়ণ এবং মহাভারতও পড়েছি সংক্ষেপিত সংস্করণে। তাও সব মনে থাকেনা। এই সব কারণে যাকে বলে পড়বার মত বই, অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যের লক্ষ লক্ষ বই-এর মধ্যে ছেঁকে বার করা যে শ-তিনেক বই পড়তেই হবে, নইলে কেউ পাত্তা দেবে না—সেই শ-তিনেক বই-এরও খান পোনেরোর বেশি বই আমি জীবনে পড়িনি। আর সেই খান পোনেরো বইও আমার সব মনে থাকেনা।

এর কোনো প্রতিকার আমার অন্তত জানা নেই। কোন্ একখানা বইএ আমি পড়েছিলাম, মানুষের মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ানো যায় কিন্তু তার একটা সীমা থাকে। সেই সীমায় পৌঁছনোর পর যদি নতুন কিছু মনে রাখতে হয় তাহলে মন থেকে অনেক কিছু বাদও পড়তে থাকে। অর্থাৎ মনে রাখতে গেলে ভুলতেও হয়। আমি যে হাজার হাজার সংবাদ বিজ্ঞাপন, লেখা, চিঠি ইত্যাদি সমস্ত জীবনে পড়েছি, যে কয়েক শো সিনেমা দেখেছি, যে কয়েকশো মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয়, বন্ধুত্ব, আলোচনা, কথাবার্তা হয়েছে, যত বাস কণ্ডাক্টর এবং দোকানদারদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা, কথা কাটাকাটি হয়েছে, সেগুলো মনে করতে গিয়ে দেখছি তার প্রায় শতকরা এক ভাগও মনে নেই। বইও তাই—যে সব বই আমাকে পড়তে হয়েছে, বা ভালবেসে পড়েছি, বা কেউ ভাল বলায় পড়েছি সেগুলোরও কতটুকুই বা মনে আছে। শতকরা আধ ভাগ? তারও কম! তবে যখন পড়েছি তখন একরকম লেগেছে—ভাল, মন্দ, মাঝামাঝি—এবং মনে আরও হরেক রকম ভাব এসেছে, সেটাই লাভ বলে মনে হয়েছে। অন্য

এক মানুষের মনের অভিজ্ঞতা আমার কাছে পৌঁছে গেছে। ভুলেছি বলে মন খারাপ করতে পারি, কিন্তু পড়ে সময় নষ্ট হয়েছে বলে আক্ষেপ করিনা, কেননা পৃথিবীতে যত হাজার হাজার মাইল দৃশ্য দেখেছি, বটগাছ, কচুগাছ, কচুরিপানা, সাপ, পাখি, ঘাস, পাইন দেখেছি, পাহাড়, উপত্যকা, নদী দেখেছি, তারও তো সব মনে নেই, কিন্তু যখন দেখেছি তখন ভাল হোক, মন্দ হোক একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, বৈচিত্র্য এসেছে। লক্ষ-লক্ষ বই-এর মধ্যে সব পড়িনি, যা পড়েছি তার সব হয়ত ভাল লাগেনি, যা ভাল লেগেছে তার সব মনে নেই, কিন্তু পড়ে গিয়েছি যখন যা পেয়েছি, আর যেটুকু সময় পেয়েছি।

তবে, একটি জায়গায়—না, দুটি তিনটি জায়গায় আমার দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলি হল— যে লেখা পড়ে হাসি পায়, ভ্রমণকাহিনী এবং দাবা।

পূর্ণেন্দু পত্রী

—তুমি পড়েছ এ-সব বই?

—আমি এঁদের আগের দু-এক পুরুষের বই কিছু-কিছু পড়েছি। এগুলো? না, এগুলো কিনে রেখেছি।

—অ, কিনে রেখেছ? তারপর?

—পড়ব।

—কবে?

…সময় পেলেই। পাচ্ছিনা যে সময় মোটেই।

উপরের কথোপকথন জীবনানন্দের 'বিলাস' গল্পের।

যত বই কিনি, বা পেয়ে যাই, তার সব, জীবনানন্দের গল্পের ঐ বিলাসের মতই, পড়া হয়ে ওঠে না আমারও। তবুও কিনি। তবুও পেয়ে গেলেই কাছে রাখি। পড়ার আনন্দ এক রকম। কোনও একদিন পড়া হবে কোনও একটা বই, তার আনন্দও কম নয়। দু-বছর হল দুখানা বই কিনেছি তাজমহল নিয়ে। বড় মাপের বই। ছবি-ছাপটায় ঠাসা। ছবিগুলো দেখেছি। ছবি দেখতে গিয়েই ডাইনে-বাঁয়ের দু-চার ছত্রে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। তার পরে আর সময় নেই। তাহলে কাল পড়বো। এই বলে রেখে দেওয়া। আর পড়া হয়নি। পড়লে আরও গভীরতর সুখ, জানি। না পড়েও কম সুখ পাচ্ছিনা। চলতে-ফিরতে চোখে পড়ছে। বইটা যে আছে, হাত বাড়ালেই পাবো, পাতা ওল্টালেই ডুবে যাবো ইতিহাসের এক অতল নীল জলে, সেও এক সুখ?

পুজোর ছুটিতে এবারে কোথায় যাওয়া হবে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা, কাশ্মীর। ছেলে, রাজস্থান। গৃহিনী, দার্জিলিং। পুজোর অনেক দেরী। মনে মনে ছবি-আঁকা চলেছে কাশ্মীরের, রাজস্থানের, দার্জিলিং-এর। যাকে দেখা হয়নি এখনও, তাকে নিয়েই স্বপ্ন রচনা। এরও একটা আলাদা সুখ আছে।

তেমনি ভূমিকার একটু পড়ে, গল্পের একটুখানি চেখে, অথবা প্রবন্ধের বই হলে গভীর কোন সত্যের অল্প একটু বাতাসা-জল মুখে দিয়ে, সরে পড়তে হবে মন দিয়ে, এই বলে যে বইটিকে নির্বাসনে পাঠানো হল আলমারীর অন্ধকার খোপে, সেও কী কম সুখ দিয়ে গেল ? আমি বড় এলেমেলো পাঠক। আগোছালো। রুদ্ধশ্বাস পাঠক নই। শৃঙ্খলাহীন। তাই কোন জিনিষ আপাদ-মস্তক জানা হয় না। সবই খামচা-খামচা। খানিকটা স্বভাবের দোষে। খানিকটা সময়ের অভাবে।

যখন সময়ের অভাব, অথবা মন উড়ছে অন্য আকাশে, তখন কোনো কিছু পড়ে নেওয়ার বা বাধ্য হয়ে পড়ার একটা সহজ উপায় হল, লেখা। জোর করে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিই প্রবন্ধের দায়। সেই সূত্রে পড়াটা হয়ে যায় খানিক খানিক। এই লেখার টানেই কলকাতা বিষয়ে যা-কিছু পড়া, ইতিহাস নিয়ে একটু আধটু ঘাঁটাঘাঁটি। ইতিহাস অবশ্য বাল্যকাল থেকেই বন্ধুস্থানীয়। স্কুলের পরীক্ষায় যখন অঙ্কে ৯, তখনও ইতিহাসে ৬৪। অথচ সাল তারিখ মনে থাকতো না। এখনো থাকে না। জীবনীর উপরও খুব টান। দু-চার দিনের জন্যে বাইরে গেলে সঙ্গে যদি কোনো বই থাকে, সে জীব না। জীবনী যেন রেল গাড়ির কাচের জানলা। অন্য একজনের চলমান বৃহৎ বিশ্বটাকে দেখা যাচ্ছে বাইরে। আবার থেকে থেকে নিজের আবছা-ঝাপসা প্রতিবিম্বটা মিশে যাচ্ছে তার সঙ্গে, জীবনী পড়তে গিয়ে দেখা যায়, সব বড়ো মাপের মানুষই জীবনের কোনও না কোনও পর্বে এক। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে কালীপ্রসন্ন, ককতো আর কাল মার্কসের আবেগ উদ্দীপনায় মৌল কোন ভেদ নেই।

জীবনী টানে আরও একটা কারণে। দুঃখের সঙ্গে বন্ধুত্বটা গাঢ় হয়। জীবনীর ভিতরে এক রকম মন্ত্র থাকে। ঝড়-ঝাপটায় ভেঙে না পড়ার মন্ত্র। বুকের গোপন অভিমান-অহংকার-উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ঊর্দ্ধমুখী করে রাখার মন্ত্র। আমার মনে আছে, প্রথম ফিল্ম-এর ব্যর্থতা যখন আমাকে দুমড়ে-মুচড়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে কালো কবরখানার দিকে, সেই সময় কী বাঁচানটাই বেঁচে গিয়েছিলাম

দৈবক্রমে হাতের সামনে বার্নাড শ'-এর জীবনী পেয়ে। চারিদিকের অপমান-লাঞ্ছনা-অবসাদ ভেদ করে বেঁচে-ওঠার, বেড়ে-ওঠার সে এক আশ্চর্য লড়াই। পড়ে, হতাশার শুকনো হাড়ে সবল, রক্তময় মাংস গজালো। মনে হয়, সব মহৎ জীবনীই কোনও না কোনও ভাবে সব মানুষের জীবনী। কবিতা পড়ার তো শেষ নেই। কবে থেকে পড়া শুরু হয়েছে। প্রত্যেক কবির কথা বলার ধরন আলাদা। শব্দ তো সেই এক। বর্ণমালা তো গোনাগুনতি। অথচ প্রত্যেক কবি আলাদা। একই শব্দকে নিয়ে কেউ বাজাচ্ছেন খঞ্জনী, কেউ খোল, কেউ মৃদঙ্গ। কবিতা পড়তে পড়তে বেঠোফেনকে মনে পড়ে। একটাই পিয়ানো। তারও গোনাগুনতি রীড। তাতে এই অশ্রুপাত, এই হিমের ঝরা, এই ছলাৎ-ছল নদী। আবার পরক্ষনেই রুদ্র ঝড়। পরক্ষনেই তুমুল সংগ্রাম। রণক্ষেত্র। উদ্দাম দামামা।

এত কবিতা পড়া হয়। অথচ লেখার সময় কাঙাল। মনে হয় কিছুই পড়িনি। মনে হয় কীভাবে লিখতে হয়, তাও বুঝি শেখা হয়নি এখনো। জমার খাতায় কোনও শব্দ নেই, অনুভূতি নেই, অভিজ্ঞতা নেই, প্রেরণা নেই। অথচ অন্যের কবিতা পড়া মাত্রই কী অবিস্মরণীয় উন্মোচন, দিগদিগন্ত যেন হেসে উঠল। বিস্ময়কর সব উপমা-অলঙ্কার-প্রতীক যেন সন্ধ্যেবেলাকার বিবর্ণ আকাশে একটা একটা করে প্রদীপ জ্বালতে গোটা আকাশটাকে ভরিয়ে তুলল আলোর মহোৎসবে। অপরের কবিতা পড়তে পড়তে সব সময়েই আমার নিজেকে মনে হয়, দীন-ভিক্ষুক। ওদের কত ঐশ্বর্য ! কত সম্পদ। আমারই বেলায় কেবল কানাকড়ি। কেবল খুদ-কুঁড়ো।

কী পড়ি ? সব পড়ি। প্রয়োজনে ডিকসনারী, প্রয়োজনে পুরাণ। মন ক্লান্ত। তখন ডিটেকটিভ। মেজাজ ভাল, পৃথিবীর ইতিহাস। হাতে কাজ নেই। অথচ সময় অফুরান। তখন দর্শন বিজ্ঞান। সামনে নতুন ফিল্ম। তখন চিত্রনাট্য। অমুকের জন্য লিখতে হবে বার্গম্যান নিয়ে। দুচার দিন শুধু বার্গম্যান। চ্যাপলিন মারা গেছেন ? তাইতো, ওঁর জীবনীটা অর্ধেক পড়া হয়েছিল। বাকী অর্ধেকটা পড়ে নেওয়া যাক এবার। সমালোচনা লিখতে হবে অবনীন্দ্রনাথ তৃতীয় খণ্ডের ? এই তো ঘাড়ে চেপেছে পাহাড়। মাথাটাকে তাহলে কদিন নিচু করে রাখা যাক অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার উপর। ডেভিড হেয়ারের দুশো বছর ? ডেভিড হেয়ারকে খুঁজতে গিয়ে বেশ কয়েকটা দিন ঘাঁটাঘাঁটি, নাড়া-নাড়ি হয়ে গেল উনবিংশ শতকের ছড়ানো-ছিটানো এবই-সেবই। এই ভাবেই পড়া।

বই পড়ার সব চেয়ে বড় শত্রু, পত্রিকা, চারপাশ থেকে প্রতিদিন শত সহস্র পত্র-পত্রিকা এসে ঘর-দোর জুড়ে বসে। তাদের প্রত্যেকের দিকে যৎসামান্য মনোযোগ দিতে গেলেও অনন্তকাল লেগে যায়। সেজন্যে ঝাড়াই-বাছাই না করে পত্রিকা পড়তে পারিনা। আমার অবশ্য অন্য একটা কৌশল আছে। দেখা গেল কোনও একটা পত্রিকায় মাত্র একটাই প্রবন্ধ আছে, যা আমার পড়ার মত। পত্রিকা থেকে সেই রচনাটি কেটে নিয়ে বাকীটা খবরের কাগজওয়ালার জন্যে। এতে সুবিধে অনেক। বই রাখার জায়গা বাঁচে। বই পড়ার সময় বাঁচে।

বেশী পড়া ভাল নয়। নির্বীর্যকরণ ঘটে যায় চেতনায়। নিজের মতামত গড়ে ওঠার সময় না দিয়ে অন্যের মতামত তাঁবু খাঁটিয়ে জগঝম্প বাজাতে থাকে। তখন কথার বদলে, কোটেশন। তা ছাড়াও আরেক সমস্যা। পৃথিবীর দুজন জ্ঞানবান কখনো এক কথা বলেন নি। ভলটেয়ার বললেন, ঈশ্বর যদি না থাকেন, তাঁকে ইনভেন্ট করতে হবে। অসকার ওয়াইল্ড বললেন, শয়তান যদি না থাকে, তাকে অবশ্যই ইনভেন্ট করা দরকার। গভীরতর জ্ঞানের রাজ্যে এই রকম তঁন্তুজাল। চাই কম-সম করেই পড়ি। পড়তে পড়তেই ভুলতে থাকি যেটুকু ভোলার।

আর কী পড়ি।

রবীন্দ্রনাথ। এখনো তিনি, অথবা তাঁর শেষ বয়সের গদ্য এবং উপন্যাসগুলো আমার কাছে নিত্য-পাঠ্য। লোকে যখন তাঁকে ঋষি বলে সম্ভাষণ করছে, তখনো তিনি ঝাঁপ দিয়ে চলেছেন এক অগ্নিকুণ্ড থেকে আরেক অগ্নিকুণ্ডে। তাঁর রচনার মুখোমুখি হলে আমি মাতৃস্নেহ পাই, আমি দেখতে পাই এক বিদীর্ণ আত্মাকে, ডস্টয়ভস্কির মত, উবামুনোর মত, যিনি ক্রমাগত বিদ্ধ হয়ে চলেছেন, পৃথিবীকে নিজেদের শেষ রক্তাক্ত আলোটুকু দেবার জন্যে, এই সব কারণেই হাল আমলের লেখা আমাকে উদ্দীপ্ত করে কম, হয়তো এই সব কারণেই আমি সব সময়ে সমসাময়িক নই।

তবু পড়ি। বই কেনা আমার প্রিয় নেশা বই পড়াটাও।

———

যাত্রা শুভ হোক

আকাশে শরতের হালকা মেঘের আনাগোনা শুরু হতেই ঘরের মানুষের কাছে সমুদ্র-পর্বতের ডাক এসে যায়। বাইরের মানুষের কাছে ঘরে ফেরার হাতছানি দুর্বার হয়ে ওঠে। মন তখন সত্যিই মেঘের সঙ্গী হতে চায়।
অগণিত মানুষের প্রাণোচ্ছল পথচলার নিত্যসঙ্গী আমরাও।

দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে

With best Compliments of

M/s Oriental Commercial Corporation

23A, Netaji Subhas Road.

IRON & STEEL MERCHANTS

Phone : 22-6070

BIVAV
Price Rs. 3.50 July-September 1978 RN 30017/76
Vol. 3 No. 1 শরৎ ঃ ১৩৮৫

A colourful name in printing

EMMO
TRADE MARK
ZINC PLATES

★ For excellent four colour half-tone reproductions, EMMO zinc plates have an unmatched reputation in the blockmaking industry
★ Fully quality controlled and tested for microscopic and other defects.
★ EMMO zinc plates prove to be more economical than imported copper plates.
★ EMMO zinc plates are available whenever and wherever you want them through Union Carbide's wide distribution channels.

EMMO zinc plates—the 1st choice of leading blockmakers.

UNION CARBIDE NOW ADDS
POWDERLESS ETCHING PLATES

For details contact:

UNION CARBIDE

UNION CARBIDE INDIA LIMITED
Registered Office 1 Middleton Street, Calcutta 700016 Tel 44-8391

P.O. Box 301 AHMEDABAD-1
P.O. Box 486 CALCUTTA-1
Silver Oak Compound Napier Town JABALPUR
XXXV/1208 'Advaita' Ravipuram Rd. COCHIN-16
P.O. Box 353 MADRAS-2
P.O. Box 59 BOMBAY-1
Silpukhuri 9, GAUHATI-3
10 Narain Singh Rd. JAIPUR-4
P.O. Box 99 LUCKNOW
P.O. Box 1675 SECUNDERABAD
P.O. Box 417 NEW DELHI-1
P.O. Box 94 PATNA-1
Mysore Rd BANGALORE 19